

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২১৮(A)

বালিকাও আমাদিগকে লইয়া অল্প আয়ে কিরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইতেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্বহস্তে কোদাল খুরপি লইয়া এখান ওখান হইতে অন্বেষণ করিয়া কত শাক সবজী বপন করিতেন। এবার রোগে পড়িয়াও যা পারিয়াছেন করিয়া গিয়াছেন।

মা সকল কার্য্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে করিতেন। অনেক সময়ে আমরা দশ জনেও যাহা করিতে পারিতাম না, মা আসিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা করিয়া ফেলিতেন। শিল্পকার্য্যও মা কিছু কিছু জানিতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যখন অনেকে কেবল পর-নিন্দা পর-চর্চ্চা করিয়া এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য কিছু না করিয়া কেবল বক্তৃতা করিয়াই ধন্য হইতেন তখন মা বলিতেন, 'ফষ্টি রেখে কাজ কর, সাহেবী বিলাতী ফ্যাসান ছাড়, পরে বক্তৃতা কোরো।' মা এই সময়ে জোলাদের প্রস্তুত এক খানি হাঁটু-পর্য্যন্ত চৌড়া কাপড় পরিধান করিয়া আনন্দিত থাকিতেন।

যখন বাবা সময় সময় অন্যত্র যাইতেন, মা আশ্রমস্থ বালিকাদিগকে লইয়া একাকী নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সুশৃঙ্খলার সহিত সকলকে পালন করিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে আশ্রমের বালিকাগণ ও আমাদিগকে লইয়া ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেন।

পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি মার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আশ্রমস্থ অবিবাহিতা বালিকা ও একটী অল্প-বয়স্কা বিধবা কন্যাকে বিশেষ যত্ন-সহকারে পালন করিতেন। প্রায়ই বলিতেন, "আমার বিধবা কন্যাটীকে যদি শেষ পর্য্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিতে পারি তবেই আমার শান্তি।" তাহাকে ও আর আর সকলকে লইয়া কত সময়ে প্রার্থনাদি করিতেন।

এই রূপে দীন-জননী মা আমার মার ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা এই সংসারে চুপে চুপে কত কাজ করাইলেন। জগতকে দেখাইলেন, একটী সামান্য প্রাণী দ্বারা সংসারে কত মহৎ কাজ সাধিত হইতে পারে। আমরা যাহাতে মার এই সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নীরবে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের কার্য্য ও মা আমাদের সম্বন্ধে যাহা চাহিতেন তাহা সমাধা করিয়া তাঁর মনে শান্তি দিতে পারি দয়াময়ী মা আমাদিগকে সেই শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীহরিপ্রভা মল্লিক।"

স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।*

সারবান চরিত্র অমূল্য জাতীয় সম্পত্তি। ধনে মানে ঐশ্বর্য্য জাতি-বিশেষ প্রচুর সম্পদশালী হইতে পারে, কিন্তু যদি সেই জাতির মধ্যে কোন কারণে প্রকৃত চরিত্রবান লোকের অভাব হয় তবে সে জাতির পতন অনিবার্য্য। আজ যে বিশাল স্রোতস্বতী আপন গৌরবে দেশবিদেশ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে, প্রকৃতির উপদ্রবে যদি তাহার ক্ষুদ্র উৎস-দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায় তবে দেখিবে তাহার স্রোতোবেগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিবে, কিছু দিন পরে তাহা "মরা গাঙে" পরিণত হইবে। জাতীয় জীবন-স্রোতের উৎস কোথায়? দেশের প্রকৃত চরিত্রবান ব্যক্তিদিগের জীবনে। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবন যে বর্ত্তমান সময়ে অপেক্ষাকৃত ম্লান হইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ কি?—কারণ ইংরেজজাতির মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত চরিত্রবান লোকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে। লাভ-ক্ষতির বিচার না করিয়া, জাতি-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, সর্ব্বত্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে

---

* জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:—পিতা ৺ হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্ত শাক্ত-উপাসক ছিলেন। পৈতৃক বাসভূমি—হুগলির অন্তর্গত থস্তান। জন্ম—জব্বলপুরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী। শৈশবে—অত্যন্ত বাধ্য ও ধর্ম্মানুরাগী। শিক্ষা—কলিকাতা ডাফ্ কলেজে পাঠকালে ডাফ্, ম্যাক্‌ডোনেল, কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রভাবে ১৬ বৎসর বয়সে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হন। তদনন্তর বি, এল, পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। কার্য্য—প্রথমে ডফ্ কলেজের অধ্যাপক, তদনন্তর হাইকোর্টে ওকালতী; সিটি ও রিপন কলেজে আইনের অধ্যাপক, মিউনিসিপালিটীর সভ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার। ধর্ম্ম প্রচার, শিক্ষা নীতিবিস্তার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে চিরদিন লিপ্ত ছিলেন। মৃত্যু—৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ।

সচেষ্ট, এমন লোকের সংখ্যা এখন সে দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা বিরল। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কর, সৈন্যবল বৃদ্ধি কর, আর যাহাই কর, দেশের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা যদি হ্রাস পায়, যাঁহাদের জীবনে ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান হইয়া বাস করিতেছে, তবে সে জাতিকে রক্ষা করে এমন সাধ্য কাহারও নাই, কোন বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ-প্রণালী সে জাতির পরাজয় নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না।

আমরা সম্প্রতি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে হারাইয়া এই প্রকার প্রকৃত চরিত্রবান্ এক মহাপুরুষে বঞ্চিত হইয়াছি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খৃষ্টান ছিলেন, ধর্ম্মমতে তাঁহার সঙ্গে আমাদের অনেক পার্থক্য ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে আমরা প্রাণ ভরিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিতাম। ধর্ম্ম মতে নহে, ধর্ম্ম জীবনে। মতের ধর্ম্ম লইয়া কলহ বিবাদ চলে, কিন্তু সত্যকে জীবনে জয়যুক্ত করিতে যে মানুষ নিয়ত প্রয়াসী, তিনি বাহিরের মতে যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া, তাঁহার নিকট হৃদয় অবনত না করিয়া থাকিতে পারে, এমন লোক সংসারে বিরল। সকল ধর্ম্মের যাহা সার, গভীর জ্ঞান ও হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি বলে সেই ধর্ম্ম লাভ করিয়া—অর্থাৎ জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কাজে, যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিয়াছেন, স্বার্থের দিকে, মানুষের মুখে দিকে না চাহিয়া তাহাই পালন করিয়া—অটল হৃদয়ে সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া—কালীচরণ তাঁহার দেশ-বাসীর হৃদয়ে এমন স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, যাহা কদাচিৎ কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির অদৃষ্টে ঘটে।

জীবনের আদর্শ যাহার যত উচ্চ, আর সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ব্যাকুলতা ও দৃঢ়তা যাহার যে পরিমাণে বেশী সেই পরিমাণে মানুষ ধর্ম্মকে জীবনে জয়যুক্ত করিতে সক্ষম হয়। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের আদর্শ ছিলেন মহাপুরুষ যীশু। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল "What would Jesus do"—অর্থাৎ "আমি যখন জীবনে যে অবস্থায় থাকি, যীশু সেই অবস্থায় থাকিলে কি করিতেন?" জীবনের সকল অবস্থায় যীশুকে হৃদয়ে রাখিয়া, এই মন্ত্র দিয়া তাঁহার পূজা করিয়া কালীচরণ জীবন সার্থক এবং বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত ও চতুর্দ্দিকে আপনার চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। সাধক যদি সর্ব্বদা ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে জীবনে পালন করিতে সচেষ্ট হন, তবে সকলেরই জীবন এই প্রকার সারবান্, এই প্রকার খাঁটি হয়। এক জন চরিত্রভ্রষ্ট অথচ বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধনমানশালী ইংরেজকে জাতীয় মহাসমিতির নেতৃস্থানীয়দিগের মধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে কি না, এই বিষয় লইয়া জাতীয় মহাসমিতির প্রতিনিধি-গণের মধ্যে যখন বিবাদ উপস্থিত হয় তখন কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুষ্টিমেয় লোকের সঙ্গে তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী সেই ইংরেজ পুরুষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। আমাদের লাভক্ষতি বিচার-বুদ্ধি লইয়া আমরা এই প্রকার সাহায্যে বঞ্চিত হওয়াটা একটা গুরুতর ক্ষতির বিষয় মনে করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার আদর্শস্থানীয় যীশুর ন্যায় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিতেন, ধর্ম্মের শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি, সেই শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিলে যাহা কল্যাণ, যাহা শুভ তাহা জয়যুক্ত হইবেই। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি পৃথিবীর মান সম্ভ্রম, সংসারের সকল সাহায্য হারাইতে হয় তাহাতে ক্ষতি কি? পরিণামে ধর্ম্মই জয়যুক্ত হইবে, এই সত্যে তিনি অটল ভাবে বিশ্বাস করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য রূপে বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারীর বিপক্ষে একাকী দণ্ডায়মান হইতে কালীচরণ কখনও ভীত হন নাই, যাহা তিনি ন্যায় বলিয়া বুঝিতেন তাহা পালন করিতে তিনি কোন পার্থিব শক্তিকেই ভয় করিতেন না।

এই যে আদর্শের অনুসরণ, এই যে কর্ত্তব্য সাধনে, ন্যায়ের অনুসরণে অকুতোভয়তা, অবিচলিত ভাব—ইহা লাভ করা কঠোর সাধনা-সাপেক্ষ। কালীচরণ সর্ব্বদা সেই সাধনে লিপ্ত ছিলেন। এই কঠোর সাধনায় সে-ই লিপ্ত থাকিতে পারে, যাহার জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির হইয়াছে—যে এই বিশাল তরঙ্গ-সঙ্কুল জীবন-সমুদ্রে স্থির ধ্রুবতারার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিয়াছে। ভক্ত কালীচরণ তাহা পারিয়াছিলেন। মানবের বন্ধু মহা-প্রাণ যীশুর উৎসর্গ ও সমর্পণময় প্রেমমূর্ত্তির মধ্য দিয়া

তিনি প্রেমস্বরূপ ভগবানের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন—এই ধ্রুবতারার পানে তাকাইয়াই তিনি যৌবনের প্রারম্ভে জীবন-তরণী ভাসাইয়া ছিলেন, চির দিন সেই দিকে তাকাইয়াই তরী বাহিয়া গিয়াছেন; আজ আমরা দেখিতেছি, তাঁহার জীবন-তরণী কূল পাইয়াছে। সত্য, প্রেম, পবিত্রতার নিশান হস্তে লইয়া তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, এখন সেই নিশান অসংখ্য হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া তিনি সিদ্ধার্থ হইয়াছেন।

এ মাসের চিত্র।

সেণ্ট অগষ্টিনের মাতা মণিকা দেবী ধর্ম্মপ্রাণা ও অতি পুণ্যশীলা নারী ছিলেন। এক নিকৃষ্ট-চরিত্র পুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, মণিকার চরিত্র-প্রভাবে এই দুঃশীল যুবক শেষে সৎচরিত্র লাভ করেন। মণিকার পুত্র অগষ্টিন পরম পণ্ডিত, কিন্তু নাস্তিক ও চরিত্রাংশে অতি হীন ছিলেন। ধর্ম্মশীলা মণিকার এজন্য দুঃখের আর সীমা ছিল না। তিনি কত ব্যাকুল ভাবে অগষ্টিনকে পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া সাধুপথে চলিতে অনুরোধ করিতেন, কত প্রকারে তাহাকে বুঝাইতেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল না। মণিকা কায়মনোবাক্যে পুত্রের পরিবর্ত্তনে জন্য ভগবানের নিকট নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতেন। সামাজিক উপাসনার পর সকলে চলিয়া গেলে ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া মণিকা বলিতেন, "কৃপা করিয়া আমার বিপথগামী পুত্রের জন্য প্রার্থনা করুন।" আচার্য্য কয়েক দিন তাঁহার অনুরোধ পালন করিলেন; শেষে একদিন বলিলেন, "ভদ্রে, আপনি গৃহে গমন করুন, যে পুত্রের জন্য এত চক্ষের জল পড়িতেছে সে কখনও কুপথে থাকিতে পারিবে না।" মণিকার এই অধঃপতিত পুত্রই অবশেষে উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া জগতে "সাধু অগষ্টিন" নামে মহা সম্মান লাভ করিয়াছেন। ব্যাকুল প্রার্থনাতে কি প্রকার অদ্ভুত ফল উৎপন্ন হয় খৃষ্টান-জগতে এই ঘটনা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্রে দুর্ব্বৃত্ত, দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুত্র নিশাবসানে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সম্পূর্ণ বেশ-পরিবর্ত্তন না করিয়াই ক্লান্তদেহে নিদ্রা যাইতেছে, আর মণিকা তাহার পার্শ্বে বসিয়া ক্রুশ হস্তে প্রার্থনা করিতেছেন।

কুমারী ফৈজি—এদেশের মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা সাধারণ ভাবে প্রসার লাভ না করিলেও মাঝে মাঝে ২।৪টী মহিলা অতি সুন্দর শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। আমাদের লেখিকা শ্রীমতী হোসেন তাহার এক দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ-ভারতে কুমারী ফৈজি আর একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইনি সুপণ্ডিতা নারী, এদেশের নারী-জাতির কল্যাণ-কামনা তাঁহার অন্তরে সদা জাগ্রত। উৎকৃষ্টরূপে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিবেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি এখন বাঙ্গালী মহিলা শ্রীমতী সরলা মিত্রের সহিত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কিছুদিন হইল ইংলণ্ডে ভারত-হিতৈষী একজন ইংরেজ "ভারতবর্ষের নারী-সমাজে পাশ্চাত্য রীতির প্রভাব" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু বিষয়টী বিশদরূপে মীমাংসিত হয় নাই বলিয়া কুমারী ফৈজির উপরে এবিষয়ে আর একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। কুমারী ফৈজি প্রভৃতি শিক্ষিতা মুসলমান-মহিলা যদি তাঁহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলা-সমাজে শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন তবে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

নূরজাহান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রাবণ মাস। বাদশাহের অন্তঃপুরে "তিগিয়া" পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইতেছে। আকবরের প্রধানা ও প্রিয়তমা মহিষী যোধাবাই অন্তঃপুরিকাগণে বেষ্টিত হইয়া "তিগিয়া"র আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত। মিহর-উল-নিশা এবং তাঁহার মাতাও উৎসবে যোগ দিবার জন্য সম্রাটের অন্তঃপুরে আসিয়াছেন। তরুণীগণ কোথাও হাস্য

পরিহাসে নিমগ্ন হইয়াছেন, কোথাও বা এক জন মণিমাণিক্য-খচিত দোলায় উপবেশন করিয়াছেন, অপরেরা তাহাকে দোল দিতেছে। আনন্দ কোলাহলে অন্তঃপুর যেন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

যোধবাইয়ের বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর, কিন্তু তাঁহার লাবণ্যময় অসীম সৌন্দর্য্য এই বয়সেও সম্পূর্ণ অটুট রহিয়াছে। সম্রাট সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতেন, সম্রাজ্ঞীর এক গুচ্ছ কেশ সসাগরা ধরার আধিপত্য অপেক্ষাও তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল।

শতাধিক পরিচারিকা সমাগতা মহিলাগণের সেবার জন্য উপস্থিত ছিল। কেহ পাখার বাতাস করিতেছিল, কেহ সুগন্ধি বিতরণ করিতেছিল, কেহ অঙ্গুলি রঞ্জিত করিবার জন্য মেহেদি প্রস্তুত করিতেছিল, অনেকে ক্রীড়া ও আমোদে মত্ত ছিল।

বেগম-গীয়াস যোধবাইয়ের পার্শ্বেই উপবিষ্টা ছিলেন। মিহর-উল-নিশা এক দল তরুণীর সঙ্গে মিশিয়া একটা বীণা হাতে লইল এবং আশ্চর্য্য শিক্ষাবলে তাহা হইতে অপূর্ব্ব স্বরলহরী উত্থিত করিতে লাগিল। বীণার সুর কখন তরল আনন্দোচ্ছ্বাসে শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্লাবিত করিতে লাগিল, কখন শান্ত গম্ভীর স্বরে সকলের অন্তরে গাম্ভীর্য্য উৎপাদন করিতে লাগিল, পরক্ষণেই আবার সকরুণ স্বরলহরী দুঃখ-ভারে সকলের অন্তর অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত করিতে লাগিল। তার পর মিহর-উল-নিশা নাচিতে লাগিল। দর্শকগণ অনিমিষ নেত্রে মুগ্ধচিত্তে তাহার অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে ওমর-খায়ম হইতে মিহর গাহিতে লাগিল :—

(১)

সাধের বসন্ত কেন যায়?
মধুর কুসুম গন্ধ কেন গো পলায়?
যৌবনের মধুগীতি কেন গো ফুরায়?

(২)

পত্র-তলে বসি' পাখী প্রাণমন মোহি' ডাকি'
কোথা পুন বল গো লুকায়?
কোথা হতে আসে সে গো কোথা চলে যায়?

(৩)

ভালবাসা, তুমি আর আমি মিলি নিয়তির সাথে,
যদি রে গড়িতে পাই বিশ্বরাজ্য খানি,
ভাঙ্গি' তবে চূর্ণ করি অনু রেণু তার
মনের মতন করি' গড়ি আর বার।

মহিলাগণ একবাক্যে মিহরের নৃত্য ও গীতবাদ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে পর্দ্দার অন্তরালে এক জন শ্রোতার হৃদয়ে কিন্তু এই স্বরলহরী তুমুল তুফানের সৃষ্টি করিতেছিল। বীণার প্রতি ঝঙ্কার, সঙ্গীতের প্রতি লয় তাহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চার করিতেছিল। গীয়াসবেগের বাটীর শিবিকা দেখিয়াই সেলিম পশ্চাদ্দার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সকলের অদৃশ্য থাকিয়া অনিমিষ দৃষ্টিতে মিহরের সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেছিলেন, মিহরের বীণাধ্বনি তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিল, তাহার নৃত্য দেখিয়া সেলিম অধীর হইলেন, সঙ্গীতে তিনি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া পড়িলেন। মিহরের সঙ্গীতের শেষ তান আকাশে মিশিয়া গেল, কিন্তু সেলিমের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহা সেই হৃদয়কে আলোড়িত ও মথিত করিতে লাগিল। তিনি রোমাঞ্চিত দেহে, আবেগ-পূর্ণ হৃদয়ে একটা কোচে শুইয়া পড়িলেন।

যোধাবাইও সেই সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি ডাকিলেন, "বাছা মিহর, এস, আমার কাছে এস।" তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া তিনি আদর করিয়া বলিলেন, "বাছা, তোমার সঙ্গীতে আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছে, এমন কোকিলকণ্ঠ কোথায় পাইলে বাছা?"

আর এক জন ওমরাহের পত্নী বলিলেন, "কি মধুর সঙ্গীত! মিহরের হৃদয়োচ্ছ্বাসকারী সঙ্গীতকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হৃদয় যেন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন থামিয়া গিয়াছিল।"

যোধাবাই বলিলেন, "বেগম-গীয়াস বাস্তবিকই অমূল্য কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন। যেমন অতুলনীয় রূপ, তেমনই গুণরাশিতে আমাদের মিহর বিভূষিত। এমন রত্নের উপযুক্ত বর পাওয়া কিন্তু কঠিন হইবে!"

বেগম-গীয়াস বলিলেন, "সম্রাজ্ঞি, কাল আমার স্বামীর নিকট শুনিলাম, আলিকুলি বেগ নামক একটী পারস্য-দেশীয় যুবকের সহিত মিহরের বিবাহ দিতে তিনি নাকি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যুবকটী শাহানশাহ বাদশাহের সেনাবিভাগে কর্ম্ম করে, আমাদের জামাতা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।"

যোধাবাই বলিলেন, "আপনাদের জামাতা হইবার উপযুক্ত কি না, তা ত আসল কথা নয়, মিহরের অন্তরে সে প্রেমোদ্রেক করিতে পারিবে কি না, মিহরকে নয়ন-মণির ন্যায় রাখিতে পারিবে কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। আমি শুনিয়াছি, আলিকুলি অসাধারণ সাহসী সৈনিক পুরুষ, কিন্তু তাহার প্রকৃতি কঠোর, কবিত্ব বা চারু-শিল্পের মর্ম্ম সে বুঝে না। যে ব্যক্তি উপযুক্ত সভাসদ হইতে পারে না, নারীর হৃদয় অধিকার করা তার পক্ষে কঠিন। এ বিষয়ে মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে পারিতেন।"

বেগম-গীয়াস। দেবি, আমিই ত কাল রাত্রে শুনিলাম, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি কি করিয়া? প্রস্তাবটী আমারও তেমন ভাল বোধ হয় নাই, কিন্তু আমার স্বামী বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাতে অবশ্যই সুফল ফলিবে।

যোধাবাই। ঈশ্বর তাহাই করুন। কিন্তু এই সম্বন্ধটী আমার মনঃপূত হইতেছে না। যাহা স্থির হইয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরাইতে পারা যাইবে না। এই কুসুম-কলিকা মিহর আলিকুলির ন্যায় কর্কশ-প্রকৃতি রসজ্ঞানবিহীন লোকের পত্নী হইবে, এ কথা ভাবিতেও আমার কষ্ট হয়। তাহার পিতা মাতা যেখানে পাঠান বেচারা মিহরকে সেখানেই যাইতে হইবে।

বেগম-গীয়াস। আমাদের দেশের প্রথাই ত এই। হিন্দুরা ত পূর্ব্বে কন্যাদিগকে স্বামী মনোনয়নের অধিকার দিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন হইতে তাহারাও সে অধিকার প্রত্যাহার করিয়াছে।

যোধাবাই। প্রথাটী কিন্তু বড়ই সুন্দর ছিল। যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত, বালিকা তাহারই গলে মাল্য প্রদান করিত, অচিরেই সেই মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হইত।

বেগম-গীয়াস। আমিও আমার স্বামীকে এই কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি এসব পসন্দ করেন না। তিনি বলেন, তরুণী বালিকারা যুবকদিগের প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারে না, অন্ধভাবে প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়।

কিঞ্চিৎ তীব্র ভাবে যোধাবাই উত্তর করিলেন, "তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। মস্তিক অপেক্ষা হৃদয়ই শ্রেষ্ঠতর বিচারক। পুরুষ মানুষ রমণীহৃদয় কি বুঝিবে বলুন! পুরুষেরা কখনই আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। পুরুষ নারীর জন্য স্বামী বাছিয়া দিবে, এবং তাহাকে ভালবাসিতে হুকুম করিবে, এ অতি অন্যায় কথা!"

গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সহিত একটী মহিলা উত্তর করিলেন, "ইহাই এ দেশের নিষ্ঠুর বিধি। এ দেশের ব্যবস্থা অনুসারে পুরুষগণ ইতর জীবের ন্যায় নারীগণকে দান বিতরণ করে—যেন নারীজাতির হৃদয় নাই!

যোধাবাই। শুধু কি তাই, পুরুষেরা মনে করে, পশুকে যেমন ইচ্ছামত বামে দক্ষিণে চালাইতে পারা যায়, নারীর হৃদয়কেও তেমনি যাকে তাকে ভাল বাসিতে আদেশ করা যায়।

বেগম-গীয়াস। ঠিক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা কি করিতে পারি? প্রথাটী অতি প্রাচীন, এখন ত বদলান যায় না?

যোধাবাই। আমার বেলা কিন্তু এই প্রথা অমান্য করা হইয়াছিল। প্রেম সর্ব্বোপরি জয় লাভ করে।

আকবরের ইউরোপীয় বেগম মেরী বলিলেন, "আমার দেশে স্ত্রীলোক নিজে স্বামী নির্ব্বাচন করে। স্ত্রীলোকেরা বাহিরে বিচরণ করিতে পারে, পুরুষদিগের সঙ্গে মিশিতে পারে, তাহাদেরই মত স্বাধীনতা-সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।"

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া যোধাবাই বলিলেন, "কি সুন্দর নিয়ম! স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া প্রকৃতির হৃদয় মুগ্ধকর মনোহর দৃশ্য চক্ষে দেখিতে কি আরাম! এখানে মার্ব্বেল পাথরের দেওয়ালের মধ্যে বন্দিনী থাকিয়া বাহ্য জগতের কিছুই দেখি না, জানি না।"

বেগম-গীয়াস। আমার স্বামী বলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে পর পুরুষের সঙ্গে ব্যাক্যালাপ করা, অপরিচিতের সম্মুখে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা, নীতি-বিগর্হিত।

মেরী। আমি কিন্তু ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না। আমাদের দেশের মেয়েরাও তোমাদের মেয়েদের মতই সতীত্বে নিষ্ঠাবতী। অনভ্যাস বশতঃ পুরুষ সম্মুখে দেখিলেই এ দেশের মেয়েদের যেমন এক অস্বাভাবিক চঞ্চলতা উপস্থিত হয় আমাদের দেশে এরূপ ভাব কল্পনার অতীত।

যোধাবাই। আপনার কথা নিতান্ত যুক্তিযুক্ত। আপনাদের দেশের নারীগণ অবশ্যই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন হইবেন, তাঁহারা আপনারা আপনার ভার বহন করিতে সমর্থ, আর আমরা সম্পূর্ণ রূপে পুরুষদিগের কৃপাপাত্রী—আত্মনির্ভর নামক গুণটীতে আমরা সম্পূর্ণই বঞ্চিত।

মেরী। আমাদের দেশের আইনানুসারে পুরুষ এক কালে একাধিক স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে না। যদি কেহ করে, তাহার জেল হয়, এই আইন অমান্য করা রাজারও সাধ্যাতীত।

যোধাবাই। আপনাদের দেশের লোকের প্রশংসা করিতে হয়। প্রথম বিবাহই যখন প্রেম-প্রসূত, তখন সে বন্ধন অবশ্যই স্থায়ী হইবার কথা, তবে আর আপনাদের দেশের লোকের বহুবিবাহ করিবার প্রয়োজন কি? বাদশাহও ইচ্ছা করেন, এ রাজ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা আরো প্রসার লাভ করে, আইন কানুন আরো সংশোধিত হয়, কিন্তু প্রজা-সাধারণ আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নয়। তিনি আশা করেন, এ দেশের বিভিন্ন জাতিগুলিকে তিনি যখন এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিতে পারিবেন, তখন অনেক উন্নতি সম্ভবপর হইবে।

মেরী। বাদশাহ বাহাদুরের অনুমান সত্য। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার মত-পার্থক্য আছে। যে সকল সংস্কার প্রয়োজন, ভবিষ্যতে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখনই তাহাতে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক, লোকের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ ধরিলে আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিতেই সে আদর্শ লোকের অন্তর বিশুদ্ধ করিবে, লোক তাহার অনুরাগী হইবে।

যোধাবাই। আপনার কথাগুলি অতি যুক্তপূর্ণ। আশা করি বাদশাহ তাঁহার সঙ্কল্পিত সংস্কারগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের মতের বিরুদ্ধে কায করিতে হয়। এই কুসংস্কার ও কুরীতি-পদদলিত দেশে বাদশাহের সংস্কারের বিষয়গুলি নিতান্তই অশ্রুত-পূর্ব্ব। সেই অন্তর্য্যামী দেবতা—যিনি বাদশাহের মহৎ অভিপ্রায় জানেন, তিনিই শুধু এই কঠিন ব্যাপারে তাঁহার অন্তরে বল বিধান করেন। তথাপি দেখিতে পাই, বাদশাহের মত সবল-হৃদয় পুরুষেরও মন সময় সময় অবসন্ন হইয়া পড়ে, সংস্কারের আশায় তিনি নিরাশ হইয়া পড়েন।

মিহর-উল-নিশার কাণে এ সকল কথার একটীও প্রবেশ করিতেছিল না। দিবা নিশি সেলিমের কথায় তাহার অন্তর পূর্ণ থাকিত। সেলিমের প্রেম-ভিত্তির উপর মিহর তাহার সুখের ঘর বাঁধিতেছিল, সুখ-স্বপ্নের ন্যায় আজ মুহূর্ত্তে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অপর পুরুষের নিকট সে বাগ্দত্তা, এই সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় তীব্রবেগে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার লাবণ্যপূর্ণ রক্তিম গণ্ড মুহূর্ত্ত মধ্যে চিররুগ্নের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় সে এতক্ষণ নীরবে স্পন্দহীন ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। এতক্ষণে তাহার চৈতন্য হইল, সে আস্তে আস্তে পার্শ্বের আর একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া একটা কোচে শুইয়া পড়িল। তাহার মুখে গভীর যাতনার চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন তাহার জীবনের সুখশান্তি চির দিনের মত অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অন্যমনস্কতা বশতঃ সেলিম যে সে গৃহে আছেন তাহাও সে দেখিতে পাইল না।

সেলিমও তাঁহার মাতা এবং বেগম-গীয়াসের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা শুনিয়াছিলেন। মিহরের বাগ্দানবার্ত্তা তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল। মিহরকে যখন তিনি গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় যেন তাহার প্রতি পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ের যাতনারাশি দূরে পলায়ন করিল, তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায়

222



মেরী ম্যাগডালিন।

তাঁহার প্রেমস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে মিহরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন।

মিহর হঠাৎ তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পলায়নপর হইল, কিন্তু সেলিমের আকুল প্রেম-দৃষ্টির নীরব প্রার্থনায় সেখানেই উপবিষ্ট রহিল। উভয়ে নির্ব্বাক হইয়া প্রেমাকুল দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। উভয়ের অবরুদ্ধ প্রেমস্রোত যেন দৃষ্টিপথে বহির্গত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সেলিম বলিলেন, "কাতরে শত বার তোমার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি, শুধু দুটী মুহূর্ত্ত আমার কথা শোন।"

হৃদয়োচ্ছ্বাসকে সংযত করিয়া মিহর বলিল, "শাহাজাদা, ক্ষমার বিষয় কিছু নাই। কিন্তু আজ বুঝি আপনার আমোদের আর কোন বন্দোবস্ত ছিল না?"

সেলিম। প্রাণাধিকে, তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর হইতে বিশ্রাম দূর হইয়াছে, আমোদ প্রমোদ লোপ পাইয়াছে, হৃদয় কেবল তোমারই অন্বেষণ করে।

মিহর। আমাকে অন্বেষণ করিবার আপনার কি প্রয়োজন? আমাকে একাকী থাকিতে দিন্।

ব্যথিত হৃদয়ে, কাতর নয়নে, সেলিম উত্তর করিলেন, "তুমি ত আমার ব্যথা জান, তবু তোমাকে দেখিয়া যে সুখ পাই তাহাতেও কেন বাধা দেও, আমার যাতনা বৃদ্ধি করিয়া তোমার লাভ কি? তোমার কি একটু দয়াও হয় না? জীবনে বুঝি কখনও দুঃখ পাও নাই?"

মিহর যাতনাপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল, "শাহাজাদা, হঠাৎ বজ্রপতনে যাহার জীবন-তরু দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে দুঃখ কেমন জানে না? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এখন যান, আপনার তরল হৃদয়ের খোসামোদ হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন্।"

সেলিম। তোমার প্রেম আমার হৃদয়কে শেলবিদ্ধ করিয়াছে, তথাপি তুমি বলিতেছ, আমি খোসামোদ করিতেছি?

ক্রুদ্ধস্বরে মিহর উত্তর করিল, "আপনি লুকাইয়া থাকিয়া সকল কথা কেন শুনিয়াছেন? সকলই ত জানেন? ঈশ্বরের দোহাই, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে একাকী থাকিতে দিন্।"

সেলিম। হাঁ, স্বীকার করিতেছি, আমি সকলই শুনিয়াছি, আর আমি যে কি বেদনা পাইয়াছি, ভগবান জানেন; কিন্তু তুমি একটীবার বল, যে তুমি আমাকে ভালবাস, তা হলে আমি সমস্ত বাধা দূর করিয়া ফেলিব, এবং এখনও তুমি আমারই থাকিবে।

মিহর-উল-নিশা সেলিমের প্রতি চাহিয়া সলজ্জ ভাবে উত্তর করিল, "আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিনেই তো সে কথা বলিয়াছি। মেয়েরা পুরুষদের মত অত লঘু-চেতা নয়; মেয়েরা যখন ভালবাসে, সমস্ত জীবন, সমস্ত হৃদয় দিয়াই ভালবাসে; অথচ পুরুষেরা পুতুলের মত নারীদিগকে গ্রহণ করে, এবং যখন আর ভাল লাগে না তখন অনায়াসে পরিত্যাগ করে।"

"সত্যই তবে তুমি আমাকে ভালবাস" এই বলিয়া সেলিম মিহর-উল-নিশার হস্ত আকর্ষণ করিয়া চুম্বন করিলেন। তার পর বলিলেন—"তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ ভাবুকতা মাত্র নয়, ইহা অমর এবং সুগভীর প্রেম, ইহা অগ্নিশিখার ন্যায় আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, এবং অন্তরের সকল ক্ষুদ্র স্বার্থপর কামনাকে দগ্ধ করিতেছে। পূর্ব্বে আমি এ বিষয়ে শিথিল ছিলাম, অনেক সময় ভাবিতাম, আমি বুঝি ভালবাসিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে আমি বুঝি নাই ভালবাসা কি বস্তু। অলিকুলিবেগের সহিত যে সম্বন্ধ হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আমি তোমার বাবাকে অনুরোধ করিব, এবং তিনি যদি না শোনেন, তবে সেই সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করিবার জন্য আমি আমার বাবাকে অনুরোধ করিব।"

মিহর-উল-নিশা দৃঢ় স্বরে বলিল, "আমি নিজেই আমার মা ও বাবাকে বলিব, তাঁরা এত নির্দ্দয় হইবেন না, যে আমাকে চিরদুঃখিনী করিবেন।"

সেলিম। প্রিয়তমে, আশান্বিত হও; বিপক্ষের বিরোধী কথায়, আমাদের প্রদীপ্ত প্রেম কিছুমাত্র ম্লান হইবে না। স্ত্রী ও পুরুষ সম্মত হইলে, কাজি আর কি করিতে পারে?

মিহর-উল-নিশা। আপনি আমার পিতার প্রকৃতি জানেন না, তিনি বড় একগুঁয়ে এবং গোঁড়া।

সেলিম। তিনি আমার কথা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিবেন না; তিনি এত নির্ব্বোধ নহেন, যে আমাকে শক্রতে পরিণত করিবেন।

মিহর-উল-নিশা। তিনি যেরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, তিনি কি করিবেন।

সেলিম। একমাত্র তুমিই আমার জীবনের শক্তি, তুমি কি করিয়া বিশ্বাস করিতেছ যে তোমা-ছাড়া আমি জীবন যাপন করিতে পারিব? আমাকে বাঁচিতে হইলে, তোমাকে চাই-ই; যতদিন আমার শিরায় রক্ত প্রবাহিত হইবে, আমা হইতে তোমার পৃথক জীবন যাপনের কল্পনাও আমার পক্ষে অসহনীয়।

এই বলিয়া সেলিম মিহর-উল্-নিশার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, প্রেমোচ্ছাসময় চুম্বনে তাহাদের অধরোষ্ঠ মিলিত হইল, তাহাদের হৃদয় যেন এক তানে স্পন্দিত হইতে লাগিল; তাহারা অনুভব করিতে লাগিল, যেন এক অবর্ণনীয় বৈদ্যুতিক প্রেম তাহাদের উভয়কে এক করিয়া, সমস্ত জগত হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে।

সেলিম মৃদু স্বরে বলিলেন,—"তোমার প্রেম এবং তোমার আদর ছাড়া আমি এ জীবনে আর কিছু চাই না। এই বিশাল সাম্রাজ্য অপেক্ষা তুমিই আমার নিকট অধিকতর প্রার্থনীয়; তোমার সহবাসে পর্ণকুটীর আমার পক্ষে নন্দন-কানন।"

মিহর-উল্-নিশা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল:— "বিধাতার ইচ্ছা বোধ হয় অন্য প্রকার—অদৃষ্টের লিখন বহু পূর্ব্বেই লিখিত হইয়া গিয়াছে, আর পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। শীঘ্রই আপনি রাজ্যেশ্বর সম্রাট হইবেন, এবং নানা প্রকার সুখসৌভাগ্য ও আমোদে মত্ত হইয়া আমাকে ভুলিয়া যাইবেন! কিন্তু আমি আমার প্রথম প্রেমের স্মৃতি কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।"

সেলিম। তোমাকে ভূলিয়া যাইব? যদি এ হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হইত, দেখিতে পাইতে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে, অন্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে, তোমার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। আমি বরং আপনাকে ভুলিতে পারি কিন্তু তুমি আমার অস্তিত্বের সারস্বরূপিনী, তোমাকে ভুলা অসম্ভব। যদি ঐ কঠোর-প্রকৃতি পারসী আমার পথে দাঁড়াইতে সাহসী হয়, তবে তাহার মস্তক নিশ্চয়ই ভূতল চুম্বন করিবে।

মিহর কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় উভয়ে দেখিতে পাইল ক্রোধকম্পিত-কলেবরে বেগম-গীয়াস তাহাদের নিকট উপস্থিত, ক্রোধে তাঁহার চক্ষু যেন অনল বর্ষণ করিতেছিল, তাঁহার সেই ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তাহারা নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল। সেলিমের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তিনি বলিলেন:—

"শাহাজাদা, আপনার ব্যবহারে আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। আপনি সাম্রাজ্যের ভাবী অধিপতি—কোথায় জনসাধারণের সম্মুখে ন্যায়-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিবেন, না আপনার এই ব্যবহার! দিবা দু প্রহরে আপনার মায়ের গৃহের পার্শ্বে আমার এই বুদ্ধিহীনা নিরপরাধিনী কন্যার সঙ্গে আপনার এরূপ তামাসা! ছি, ছি!"

সেলিম। আমার প্রতি একটু সদয় হউন, দয়া করিয়া আমার কথায় কর্ণপাত করুন।

বেগম-গীয়াস। যুবরাজ, কথায় বলে, স্বচক্ষে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য আর দর্পণের প্রয়োজন হয় না। আপনার কথা শুনিবার আমার আর প্রয়োজন নাই। মিহর, উঠে আয়।

সেলিম। ভদ্রে, আমি আশা করি, মিহর-উল-নিশা নিজেই সাক্ষ্য দিবে, যে আমি তাহার সঙ্গে কোনরূপ অভদ্রোচিত ব্যবহার করি নাই।

মিহর। মা—

বেগম-গীয়াস বাধা দিয়া বলিলেন, "চুপ কর্ হতভাগী।" তৎপর সেলিমের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমার কন্যাকে গোপনে পাইয়া তাহাকে এই প্রকারে প্রলুব্ধ করিবার স্বপক্ষে আপনার কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে না।" এই কথা বলিয়া দৃঢ় হস্তে মিহর-উল-নিশার হাত ধরিয়া তিনি যোধাবাইয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। যোধাবাই তখন নিজ গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

২য় ভাগ । চৈত্র, ১৩১৩ । ৮ম সংখ্যা ।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একদা দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতা-বিয়োগে অত্যন্ত ব্যাকুল ও অধীর হইয়া সীতান্বেষণার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি ও লক্ষ্মণ বন-মধ্যে শবরী নাম্নী এক বিদুষী সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ঃ—

শুদ্ধতারামিবখ্যাতাং শবরীমাপতুর্ব্বনে ।
বসানাং বল্কলে শুদ্ধে বিপুলৈঃ কৃতমেখলাম্ ॥
ক্ষামামঞ্জনপিণ্ডাভাং দণ্ডিনীমজিনাম্বরাম্ ।
অগৃহ্যপদবৎ সাধ্বীং স্পষ্টরূপামবিক্রিয়াম্ ॥
অগৃহ্যাং বীতকামত্বাৎ দেবগৃহ্যমনিন্দিতাম্ ।
ধর্ম্মকৃতারতাং নিত্যম্ অবৃথ্যফলভোজনাম্ ॥
দৃষ্ট্বা তামমূচ রামো যুগাখ্যাত ইব শ্রমম্ ।
সতামুচেঽথ কচ্চিত্বম্ অমাবাস্যাসমুন্নয়ে ॥
পিতৃণাং কুরুষে কার্য্যম্ অব্যগ্রৈঃ স্বাদুভিঃ ফলৈঃ ।
অবশ্য পাক্যং পবসে কচ্চিত্বং দেবতাগ্নবিঃ ॥
আসাব্যমধ্বরে সোমং দ্বিজৈঃ কচ্চিন্নমস্যসি ।
আবন্যাসঞ্জয়োঃ কচ্চিৎ সমাজ্ঞেন প্রচীয়তে ।
কচ্চিদগ্নিমিবানাব্যং কালে সংমগুসেহ তিথিম্ ।
কুণ্ডপাষাবতাং কচ্চিৎ অগ্নিবিত্যাষতাং তথা ॥
কথাভীরমসে নিত্যম্ উপচার্য্যাবতাং শুভে ।
নায়ানাসি তপসাস্তী গুরুন্ সম্যক্ অতুতুষঃ ।
যমাস্লোদ বিজিষ্টাস্তং নিজায় তপসেতুষঃ ॥

সর্ব্বকার্য্য-সুসিদ্ধিকারিণী পুষ্যানাম্নী জগদ্বিখ্যাতা তারার ন্যায় সর্ব্বসিদ্ধি-সম্পাদিনী, শুদ্ধা, পুণ্যবতী, বল্কল-পরিধায়িণী মুঞ্জ-মেখলাশালিনী, যোগাভ্যাস-ক্ষীণকলেবরা, পলাশ-দণ্ডবতী, মৃগচর্ম্মোপবিষ্টা, নির্ব্বিকারা, সাধ্বী, কৌটিল্য-খলতাদি-দোষ-বর্জ্জিতা, অমায়িক-স্বভাবা, ইন্দ্রিয়-বিকারা-জনক-ফল-মূলাহারিণী, শবরী নাম্নী আর্য্য ঋষিকার আশ্রমে রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভাই উপস্থিত হইয়া নিবিড়-বন-ভ্রমণ-জনিত শ্রান্তি দূর করিলেন। সেই আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক ঋষিকা শবরীকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের বোধ হইল, যেন দিব্য যুড়ী গাড়ীতে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন ; অরণ্য-বিচরণ-জনিত সমস্ত ক্লেশ তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “আপনি অমাবস্যা তিথিতে পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে উত্তমোত্তম সুস্বাদু ফলাদি দ্রব্য দ্বারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন তো ? ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের প্রীত্যর্থে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন তো ? ব্রাহ্মণদিগের সহিত যজ্ঞে সোমলতাকে নমস্কার করিয়া থাকেন তো ?

প্রাতঃ-সন্ধ্যা ও সায়ং-সন্ধ্যা উপাসনাকালে আচমনাদি ক্রিয়া যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয় তো? দক্ষিণাগ্নি অর্চ্চনার ন্যায় যথাকালে অতিথি সেবা করেন তো? হে কল্যাণি, যজ্ঞ-বিশেষাঙ্গে অগ্নি-বিশেষ-চয়নকারী ব্রাহ্মণদিগের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-কথা শ্রবণে ও আলাপে সর্ব্বদা রত থাকেন তো? তপশ্চরণে আয়াস বোধ করেন না তো? আপনার শিক্ষা দীক্ষার আচার্য্য গুরুদিগকে সম্যকরূপে সন্তুষ্ট করিয়াছেন তো? যমের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছেন তো? নিজের তপস্যায় সন্তুষ্ট বোধ করিয়াছেন তো?" শবরী উত্তর প্রদান করিলেন, "সকল বিষয়েই কুশল জানিবেন।"

এই সকল শ্লোক পাঠ করিলে সহজেই প্রতীতি জন্মে, সেকালে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও যোগাভ্যাসাদি উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি আচরণ করিতেন। তাঁহারাও পুরুষ যোগীর ন্যায় বল্কল পরিধান, মুঞ্জমেখলা ও পলাশ-দণ্ড ধারণ করিতে পারিতেন, মৃগ-চর্ম্মোপরি উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাস এবং অমাবস্যাদি পুণ্য-তিথিতে পুরুষের ন্যায় শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পৈত্র ক্রিয়া করিতে পারিতেন। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের সহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-কথার আলোচনা করিতে পারিতেন, এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞান বলে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া কৈবল্যপদ লাভের অধিকারিণী ও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পূজনীয় জনেরও অন্বেষণীয়া হইতে পারিতেন। পৌরাণিক যুগে লোপামুদ্রা অরুন্ধতী প্রভৃতি এমন অনেক ভারত-মহিলার ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা সুশিক্ষা এবং গভীর সাধনা বলে জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক যুগ ছাড়িয়া দিয়া যদি বৌদ্ধ যুগের অবস্থা আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে বৌদ্ধ যুগেও ভারত-মহিলাগণ শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

কপিলবস্তু নগরে এক জন ধনবান্ বৌদ্ধের শুক্লানাম্নী অতি রূপসী ও গুণবতী এক কন্যা ছিলেন। একে তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ-গুণ, তাহাতে আবার বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী পিতার অতুল ধন-সম্পত্তির তিনিই এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী; সুতরাং অনেক রাজকুমার তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই শুক্লার কর্ণে ভগবান্ বুদ্ধের নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য-তত্ত্বের অমৃতময় উপদেশাবলী প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি অতুল সুখভোগের কামনা পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা ব্রতে জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ক্রমে আদর্শ তপস্বিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, যে তিনি ক্রমে তপস্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া অর্হৎ পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর তত্ত্ব-জ্ঞানে ও গভীর গবেষণাপূর্ণ উপদেশ-বার্ত্তা শ্রবণে অনেক রাজকুমারের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও চমকিত হইতেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, তপঃ, দান ও অতিথি পরিচর্য্যাদি সৎকার্য্য সাধনে সতত রত থাকিয়া শুক্লা মানব জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তী নগরীতে সোমানাম্নী এক ব্রাহ্মণ দুহিতার এ প্রকার মেধা ও স্মরণশক্তি ছিল, যে একবার মাত্র যাহা শুনিতেন তাহা পুনরায় শুনিবার তাঁহার প্রয়োজন হইত না। এই অসামান্য মেধা ও স্মৃতিশক্তির গুণে তিনি সমস্ত বৌদ্ধ গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তপশ্চর্য্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া তিনি অর্হত পদ লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধদেব অনেক মহিলাকে অসাধারণ তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্পন্না ও বৈরাগ্যবতী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রকার বহু মহিলার আখ্যায়িকা বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত আছে। ফলতঃ সে কালে এ দেশে বিদুষী ও যোগ-পরায়ণা রমণীর অভাব ছিল না।

একদা "গিরিবন্ধু-সঙ্গম"-দিবসে এক মহাভোজ উপলক্ষে নানা দিগ্দেশ হইতে বহু নরনারীবৃন্দ শ্রাবস্তী নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দক্ষিণাপথ হইতে একটী যুবতী নর্ত্তকীও আসিয়াছিল, তাহার নাম কুবলয়া। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ নগরীতে আমার সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারে, এমন কে আছে?' তাহাতে এক জন উত্তর করিল, 'গৌতম নামক এক জন শ্রমণ আছে।' কুবলয়া একথা শুনিবামাত্র

তৎক্ষণাৎ জেতবনে ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুখে গমন করিয়া স্বকীয় সৌন্দর্য্যের ছটা বিস্তার পূর্ব্বক আকর্ষণী শক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। কথিত আছে, ভগবান বুদ্ধের অমানুষিক শক্তি-মাহাত্ম্যে নর্ত্তকীর অতুল রূপলাবণ্য সহসা বিনষ্ট হইয়া গেল। যুবতী সহসা অশীতি-বর্ষীয়া কঙ্কালসারা বিকটরূপা বৃদ্ধায় পরিণত হইল। জীবন্ত পুণ্যের সংস্পর্শে নিরন্তর পাপনিরতা বারাঙ্গনার আত্মাবস্থা উপলব্ধি ও অনুতাপ-বোধ সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। তৎক্ষণাৎ কুবলয়া ভগবান বুদ্ধের চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক আপনার মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল, তাহার অনুতাপ-জর্জ্জরিত হৃদয় শান্তি লাভের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া পড়িল। বুদ্ধদেব দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং তাহাকে শিক্ষা দিয়া পরম বিদুষী করিয়া তুলিলেন। তিনি নিজেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কারণ, অনেক সময় শিক্ষাদানাদি কার্য্যের ভার আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণের উপরই ন্যস্ত থাকিত, কিন্তু কুবলয়া স্বয়ং বুদ্ধদেবের নিকট শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিল।

একদা ব্রহ্মদত্তা নাম্নী বারাণসী-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য নানা দেশীয় নৃপতিগণ অধীর হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রহ্মদত্তা সকলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রাধ্যয়নে কালাতিপাত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। অবশেষে ভগবান্ কশ্যপ যখন ঋষিপত্তনে বাস করিতে আসিয়াছিলেন, তখন সেই সুযোগে ঐ রাজকন্যা তাঁহার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, যে তিনি ভগবান কশ্যপের নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণে অভিলাষিণী হইয়াছেন। ভগবান কশ্যপের নিকট তিনি তপশ্চর্য্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে রাজকুমারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী কতিপয় রাজকুমার তাঁহাকে তথা হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র যোগবলে রাজকুমারী আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাজকুমারগণ এই ব্যাপার অবলোকনে স্তম্ভিত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে, হতাশ হৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এক সময় ভগবান বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় প্রসেনজিৎ ও ব্রহ্মদত্ত নামক দুই নৃপতির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তদুপলক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইবার উপক্রম হয়। সেই সময় প্রসেনজিতের এক কন্যা ও ব্রহ্মদত্তের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। তাঁহারা উভয়েই প্রস্তাব করিলেন, যে একের পুত্রের সহিত যদি অপরের কন্যার উত্তর কালে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে তাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষান্ত হইয়া মৈত্রী সংস্থাপন করিতে পারেন। এই প্রস্তাব অনুসারে যুদ্ধ বন্ধ হইল। অনন্তর প্রসেনজিতের দুহিতা ক্ষেমা যখন পরিণয়-যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি প্রকাশ করিলেন, যে তিনি আজীবন কুমারী-ব্রত অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নে কালাতিপাত করিবেন। প্রসেনজিত কন্যার এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং ব্রহ্মদত্তকে লিখিলেন, তিনি যেন শীঘ্র তাঁহার পুত্রের পরিণয়-কৃত্য সম্পন্ন করাইতে যত্নবান হয়েন। এ দিকে তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষিণী ক্ষেমা গোপনে এই বিষয় অবগত হইয়া ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট জেতবনে পলায়ন করিলেন। বুদ্ধদেবও তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ গ্রহণের যোগ্য পাত্রী বিবেচনা করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ প্রভাবে ক্ষেমা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সারতত্ত্ব শিক্ষা করিলেন ও ষড়রিপুর প্রভাব অতিক্রম করিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ আসিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্রম হইতে ধরিয়া লইয়া গেলেন। প্রসেনজিৎ ক্ষেমার বিবাহানুষ্ঠানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। পুরোহিত বর ও কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া উভয়কে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ আলেপন-চিত্রিত মঙ্গল পীঠোপরি সমাসীনা ক্ষেমা পীড়ি সমেত ধীরে ধীরে আকাশমার্গে উঠিতে লাগিলেন। আকাশে উত্থিত হইয়া তিনি নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার প্রদর্শনপূর্ব্বক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগি-

লেন। বিবাহ-সভাস্থ সকলে এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ স্তম্ভিত হইলেন। অনন্তর সকলের সবিনয় প্রার্থনায় ক্ষেমা আকাশমার্গ হইতে অবতরণ করিলেন। আর তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে কেহ সাহসী হইল না। বিবাহ স্থগিত রহিল। তিনিও পিতার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তপশ্চর্য্যা অবলম্বন করিলেন। প্রাণায়াম কুম্ভকাদি শিক্ষার প্রভাবে ক্ষেমা আকাশে উঠিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, ক্ষেমা আকাশে উঠিবার শক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তী নগরীতে এক ধনবান বণিকের প্রভবা নাম্নী এক যুবতী কন্যা ছিল। কন্যাটীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য নগরীর সম্ভ্রান্ত লোকেরা ও রাজকুমার অত্যন্ত লালায়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু বণিককন্যা প্রভবা তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট নির্ব্বাণতত্ত্ব শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষা প্রভাবে প্রভবা মহাপ্রভাবা হইয়া উঠেন। ক্রমে তিনি অর্হতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যে এক জন্মেই প্রায় কেহই ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে না, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মকৃত অভ্যাস এই জন্মে কার্য্যসিদ্ধি সম্পাদনে অনেক সহায়তা করিয়াছিল।

বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে উচ্চশিক্ষিতা ও সেবাপরায়ণা বহু মহিলার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় ছিল—বৌদ্ধ যুগেই হউক, আর হিন্দু-প্রাধান্য সময়েই হউক—তৎকালে ভারতের মহিলাগণ অতি উচ্চ শিক্ষাই লাভ করিতেন।

শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী।

আয় ঘুম আয়।

ঢুলে ঢুলে ঢুলে ঢুলে আয় ঘুম আয়,
ফুলের দোলায় চেপে ছাওয়ায় ছায়ায়,
আয় ঘুম আয়।
ঠিক দুপুরে পথের 'পরে তপ্ত ধূলা ওড়ে,
গাছের তলে পথিকগুলি পথের ধারে প'ড়ে,
ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা ছাতা, ধুলো মাখা গায়,
তাদের চোখে ঘুম দিয়ে, আয় ঘুম আয়।

চোখ বুজিয়ে গাভী গুলি মাঠে জাওর কাটে,
রাখাল বালক অশথ তলায় তেষ্টায় বুক ফাটে,
রোগার ঘরে জলে বাতি সারা রাতি ধ'রে
শয্যাখানি তপ্ত আগুণ এ পাশ ও পাশ করে,
নাইক কেহ আপন জনা মুখের পানে চায়,
তাদের চোখে ঘুম দিয়ে, আয় ঘুম আয়।

হাজার হাজার দাসী করে চামরের বা,
রাজা রাণী সোণার খাটে রূপার খাটে পা,
অগুরু চন্দনের গন্ধে মাতোয়ারা ঘর
ফুলের মাঝে ফুলের সাজে শুয়ে কনে বর,
সারা রাতি গন্ধবাতি সুখে ঘুম যায়
তাদের চোখের ঘুম নিয়ে, আয় ঘুম আয়।

আয় ঘুম আয়,
মেঘের নায়ের 'পরে চড়ে বাদলা হাওয়ায়।
আয় ঘুম আয়,
তোকে বসতে দোব সোণার পিঁড়ে আঁচলের বায়,
খেতে দিব ক্ষীর কর্পূর মর্ত্তমান কলা,
আমার যাদুর চোখ জড়িয়ে রও রে সারা বেলা।

টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ে ফিঙেয় করে গান,
আমার ঘরে আছে দেখ গোলা-ভরা ধান,
আম কাঁঠালের বাগান দেখ, নাচে বকুল গাছ,
বাঁধা ঘাটে ভেসে বেড়ায় রুই কাতলা মাছ,
চালে ঝোলে চাল কুমড়া, কলস কলস ঘি,
আমার সুখের কথা বাপু তোমায় লেখা দি,
আয় ঘুম আয়,
ফুলের দোলায় চেপে ছাওয়ায় ছায়ায়।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী।

কলের তাঁতের প্রতিযোগিতা উপস্থিত হওয়াতে কার্ণেগীর পিতার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায়, এবং পুনরায় ব্যবসায়ের সুবিধা করিবার নিমিত্ত ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া তিনি সপরিবারে আটলান্টিকের পরপারে যুক্ত-রাজ্যের পেনসিলভেনিয়া প্রদেশে গমন করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহার এক বৎসর পরে কার্ণেগী এক সুতার কলের কারখানায় সাপ্তাহিক ৫ টাকা বেতনে একটী সামান্য কর্ম্ম গ্রহণ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি কিঞ্চিৎ অধিক বেতনে টেলিগ্রাফ আফিসে একটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্ম প্রাপ্তির কিছুকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কর্ম্ম-নিপুণতা, এবং অকৃত্রিম সাধুতা দ্বারা ক্রমে তিনি সেই আফিসেই অতি উচ্চপদ লাভ করেন। তিনি এই সময়ে যে বেতন পাইতে লাগিলেন তাহা দ্বারা অনায়াসে মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পালন করিয়াও কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম হইতেই ব্যবসায়ের দিকে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কার্ণেগী ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি কল কিনিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। কর্ম্মচারী-দিগকে তিনি সততা ও প্রেমে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, এ কারণ তাহারাও অতি যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কলের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিত।

তিনি ২৮ বৎসর কাল লৌহের কারবারে লিপ্ত ছিলেন। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলে কার্ণেগী নিজেই যে শুধু ধনকুবের হইয়াছেন, এমত নহে, লৌহ-কারবারের উন্নতি বিধান করিয়া তিনি আমেরিকারও প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আটাস বৎসর পূর্ব্বে গ্রেটব্রিটেনে আমেরিকা অপেক্ষা তিন গুণ অধিক লৌহ উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমান সময়ে গ্রেটব্রিটেন অপেক্ষা আমেরিকাতে দ্বিগুণ লৌহ উৎপন্ন হয়। আটাস বৎসর কার্য্য করিয়া কার্ণেগী যখন অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি আমেরিকার মধ্যে দ্বিতীয় ধনকুবের। এক্ষণে তাঁহার বার্ষিক আয় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ সহস্র ডলার অর্থাৎ ৪ কোটি ৮০ সহস্র টাকারও অধিক;—তাহা হইলে তাঁহার দৈনিক আয় ৪০ সহস্র ডলার অর্থাৎ ১ লক্ষ ৩৭ সহস্র টাকার উপর। এত দরিদ্র অবস্থা হইতে এইরূপ ধনকুবের হইয়াও কোন দিন তাঁহার কোনরূপ অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ পায় নাই, বরং তাঁহার কথাবার্ত্তার ধরণে ধনের প্রতি তাঁহার অনাসক্তির ভাবই প্রকাশ পায়।

শুধু টাকার জন্যই কার্ণেগীর নাম সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় নাই, ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে তাঁহার ন্যায় ধনী আরও আছেন, তিনি তাঁহার ধনের যে প্রকার সদ্ব্যবহার করিতেছেন তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব ও পৃথিবী-ব্যাপী সুযশ। তাঁহার অর্থ কি প্রকারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে পরোপকারে নিয়োজিত হইতে পারে তিনি সর্ব্বদা তাহা চিন্তা করেন। তিনি তাঁহার অর্থ দ্বারা আমে-রিকার ও ইংলণ্ডের নানাস্থানে পুস্তাকাগার স্থাপন করিয়া দিতেছেন। কার্ণেগীর বিশ্বাস, প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইলেই মানুষের সকল অভাব মোচন হয়। সেই জন্য তিনি আপনার বিপুল অর্থরাশি জগতের শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। শৈশবে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া-ছিলেন, স্কুল বা কলেজে অধ্যয়নের সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু লোকের নিকটে পুস্তক চাহিয়া লইয়া এইরূপ অবস্থার ভিতরেও নিজের প্রবল অধ্যবসায় গুণে, তিনি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। নিজের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া, তাঁহার ন্যায় নিঃস্ব যুবকেরা যাহাতে বিনাব্যয়ে পুস্তক পাঠ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু নগরীতে পুস্তাকাগার স্থাপন করিয়াছেন। শৈশবে মাতৃভূমি স্কটলণ্ড পরিত্যাগ করিলেও তিনি মাতৃভূমিকে কখনও বিস্মৃত হন নাই; মাতৃভূমির বিশ্ববিদ্যালয় গুলির জন্য কার্ণেগী বহু অর্থ দান করিয়াছেন। স্কটলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যাহাতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকের সন্তানেরা প্রবেশ লাভ করিতে পারে, এই জন্য তিনি প্রায় কোটী টাকা দান করিয়াছেন। ইহার সুদ হইতে দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন ও পুস্তক ইত্যাদি দেওয়া হইবে।

কার্ণেগীর জীবন অতি পবিত্র, ধূমপানের দোষ পর্য্যন্ত ইঁহার পবিত্র জীবনকে স্পর্শ করিতে পারে

নাই, ইংরাজিতে "যাহাকে Plain living and high thinking" বলে কার্ণেগী ধনীশ্রেষ্ঠ হইয়াও সেই সাত্ত্বিক মন্ত্র আজীবন সাধন করিতেছেন। ইঁহার বিলাসিতা-পরিশূন্য পরিচ্ছেদ দর্শন করিয়া জগতের দাম্ভিক ধনীগণও লজ্জিত হইয়া থাকেন। তিনি কলপ দেওয়া কাপড় পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। রেলওয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন না, থিয়েটারের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বসেন না। জগতের ধনীগণের মধ্যে, কার্ণেগী স্বীয় সুখসাধনার্থে যত অল্পব্যয় এবং পরপ্রীতিসাধনার্থে যত অধিক ব্যয় করেন এমন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

জগতের কোটী কোটী নরনারী দিবানিশি ধনের পশ্চাতে ছুটিতেছে, যাহারা ধনী, ধনমোহ তাহাদিগকে বিলাসিতা ও আত্মসুখের গহ্বরে নিপাতিত করিতেছে, ধনগর্ব্বে তাহাদের প্রভুত্বস্পৃহা দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে অবিনয়ী, অত্যাচারী ও দাম্ভিক করিয়া তুলিতেছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই জন্যই বিষয়ীর সংসর্গ পর্য্যন্ত ধর্ম্মলাভের বিরোধী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, মহাত্মা যীশু এই জন্যই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ ধনীদিগের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য জড়বাদের মধ্যে বাস করিয়াও, সুখভোগের শত উপকরণ সম্মুখে পাইয়াও মহাত্মা কার্ণেগী যে শ্রমোপার্জ্জিত ধনরাশি এইরূপে জগতের কল্যাণের জন্য মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতে পারিতেছেন ইহা বাস্তবিকই বর্ত্তমান যুগে এক অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য।

আমরা কার্ণেগীর বৃহৎ বৃহৎ দানের একটী তালিকা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

১৪০০ পুস্তকাগার ৪,২০,০০০০০ ডলার; ৫১টী কলেজ ৮০,০০০০০ ডলার; অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদিগের বৃত্তি ১,০০,০০০০০ ডলার; কার্ণেগী বিদ্যালয় ১,০০,০০০০০ ডলার; কার্ণেগী সাহায্য ফণ্ড ৯০,০০০০০ ডলার; স্কচ্ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ১,০০,০০০০০ ডলার; পিট্সবর্গ টেক-নিক্যাল স্কুল সমূহ ১,০০,০০০০০ ডলার; হেগ্ শান্তি-মন্দির ১৫,০০০০০ ডলার; নিউইয়র্ক ইঞ্জিনিয়ার সমিতি ১০,০০০০০ ডলার; পিট্সবর্গ শিল্প প্রদর্শনী ২০,০০০০০ ডলার; বিবিধ ১,৭০,০০০০০ ডলার।

মোট ১২,০৫,০০০০০ ডলার।

অর্থাৎ ৩৭½ কোটি টাকারও অধিক। গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কার্ণেগী সোওয়া তিন কোটী টাকার উপর দান করিয়াছেন।

শ্রীপ্রীতিবালা।

পরকাল।

আছে প্রাণ, আছে প্রেম, আছে পরলোক,
হয় যদি হোক ভুল—হোক্ হোক্ হোক্।
পাব মরণের কোলে জীবন-জীবন,
মরণ মরণ নহে; অরুণ-কিরণ
সেই রজনীর শেষে, নবীন প্রভাতে।
আছে জাগরণ-গীতি আলোকে জাগাতে
মুদিত নয়ন দুটী; আছে পরলোক,
আছে প্রাণ, আছে প্রেম, ভুল হয় হোক্।
নিত্য নব শত শত সূক্ষ্ম তর্ক নিয়ে
ভাঙ্গিতে এস না ভুল; যুক্তি-জাল দিয়ে
জড়িত করো না জ্ঞান; তর্ক চাহি না'ক,
চাহি না চাহি না যুক্তি দূরে দূরে থাক।
ভুল যদি হয় হোক্, ক'দিনের ভুল ?
জীবন-সন্ধ্যায় আসি পারাবার কূল
হ'তে জানি এক দিন বাঁধন খুলিয়া
দিবে মৃত্যু তরণীর, কি আছে দেখিয়া
লব সেই দিন আমি,—তত কাল ধরি'
আছি কূলে, যত কাল এই গান করি,—
আছে প্রাণ, আছে প্রেম, আছে পরলোক
হয় যদি হোক্ ভুল—হোক্ হোক্ হোক্।

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়।

মগের মুল্লুক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মদেশে চীন ও জাপানের নানাবিধ জিনিষ প্রচুর আমদানি হয়। বর্ম্মারা সাধারণত বিলাসপ্রিয় জাতি। সুন্দর এবং সখের জিনিষ দেখিলেই ইহারা তাহা ব্যবহার করে। পূর্ব্বে আমি লিখিয়াছি যে, ইহারা খুব সেলাইয়ের কল ব্যবহার করে,—সেই প্রকার আর একটী জিনিষ সম্বন্ধেও বলিতে পারি। ইহাদিগের প্রায় ঘরেই বাই-সাইকেল দৃষ্ট হয়। দশ বার বৎসরের ছোট ছেলে হইতে প্রৌঢ় বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সাইকেল চড়িতে শিখে এবং পারে। ব্রহ্মদেশের ছোট ছোট সহরে যত বাইসাইকেল দৃষ্ট হয়, আমাদের বঙ্গদেশে বোধ করি কলিকাতা ব্যতীত অন্য কুত্রাপি তত বাইসাইকেল দৃষ্ট হইবে না।

ইহারা ঘর দ্বার বেশ সাজাইয়া রাখিতে জানে। নিজেরা শাক ভাত ছাড়া হয়ত খাইতে পায় না, কিন্তু বাহিরে যাইবার জন্য ভাল পোষাক নাই, বা ঘরে কেহ আসিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইবার জন্য দুই এক খানি চেয়ার, চা পানের ভাল বন্দোবস্ত, ভাল পাত্রে করিয়া পান চুরুট খাইতে দিবার বন্দোবস্ত, এক খানি টেবিল ইত্যাদি নাই, এরূপ দেখা যায় না। একটু ভাল অবস্থা হইলে ত কথাই নাই, টেবিল, চেয়ার, ছবি ইত্যাদি দ্বারা ঘর সাজাইয়া রাখে। কেহ বাড়ীতে অতিথি ভাবে থাকিতে চাহিলে তাহাকে শুইতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যা দিবে। রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে উভয় পার্শ্বে বর্ম্মাদের সুসজ্জিত গৃহ দেখিয়া বেশ আনন্দ হয়।

ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম। একাধারে পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, ঝরণা, বন, উপবনের সমাবেশ, এ প্রকার দৃশ্য প্রায় অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। এখানে প্রকৃতি-মাতারই অতুল সৌন্দর্য্য বিদ্যমান, তদুপরি আবার ইংরাজ-রাজ বড় পুল, খালের দরজা ইত্যাদি দ্বারা স্থানে স্থানে সেই সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-দেশের যত নদী আছে তাহার মধ্য দিয়া ষ্টীমার বা নৌকায় চলিতে আরম্ভ করিলে প্রায় প্রত্যেক নদীর উভয় পার্শ্বেই পর্ব্বত-শ্রেণী, তৎপাদমূলে নানা জাতীয় বৃক্ষাদি, বন, উপবন ও লোকালয়ের দৃশ্যে প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়া যায়। ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে বর্ম্মাদের পর্ব্বোপলক্ষে আমরা মৌলমিনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সে সময় যে কি চমৎকার দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না।

এ দেশে আমাদের দেশীয় প্রায় সকল প্রকার বৃক্ষ এবং লতাপাতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখি নাই। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার নূতন রকমের বৃক্ষ, ফল ইত্যাদিও দৃষ্ট হয়।

রেঙ্গুন।

বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন। বর্ম্মা রাজার সময় মান্দালে রাজধানী ছিল। রেঙ্গুন আমাদের কলিকাতারই ন্যায়। তবে লোকসংখ্যা কলিকাতার তুলনায় এখনও কম, এবং সহরও কিঞ্চিৎ ছোট। কিন্তু চাকুরী এবং নানা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে দিন দিনই লোকসংখ্যা অতি দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। সহরও সে জন্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। রেঙ্গুন সহর কলিকাতার ধরণে নির্ম্মিত হইলেও অনেক বিষয়ে সহরের নির্ম্মাণ-প্রণালী উৎকৃষ্টতর। এখানকার পথ ঘাট গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বেশ সোজা। সম্প্রতি রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো এবং বৈদ্যুতিক ট্রাম হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে কেরোসিনের আলো ছিল এবং ইঞ্জিনে ট্রাম টানিত। এখানে সহরের মধ্য দিয়াই ট্রেণ গিয়াছে। উপরের পোল দিয়া মানুষ, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি যাতায়াত করে, নিম্নে বাষ্পীয় শকট দ্রুতবেগে গমন করে, এবং সহরের মধ্যেই এবং রেঙ্গুনের খুব নিকটস্থ সহরতলীতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই সকল ট্রেণ যাতায়াত করে, এবং মাইল প্রতি এক পয়সা ভাড়া দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। প্রতি এক মাইল অন্তরই ষ্টেসন আছে। রেঙ্গুনে ঘর ভাড়া অত্যন্ত অধিক, তাই অনেকে সহরতলীতে বাস করেন এবং প্রতিদিন রেলে অনায়াসে আফিসাদি করিয়া থাকেন।

সহরের মধ্যটীও বেশ সুসজ্জিত। এখানে যেন সহরটী এবং সহরতলীগুলি অচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত।

229

রেঙ্গুনের গলির নাম ১ম ষ্ট্রীট, ২য় ষ্ট্রীট, ৩য় ষ্ট্রীট, এই ভাবে দেওয়া। যত পাশাপাশি রাস্তা আছে তার অধিকাংশ গুলিরই এই ভাবে নাম হইয়াছে, কয়েকটা অন্য নামও আছে। আর লম্বা ভাবে যত রাস্তা সেগুলির অন্য নাম। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বাড়ীর ত নম্বর আছেই।

রেঙ্গুনে অনেক বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস। এখানে যত বিভিন্ন জাতীয় লোকের সমাবেশ দৃষ্ট হয় অন্য কুত্রাপি তদ্রূপ আছে কি না সন্দেহ। তুলনায় বর্ম্মা জাতীয় লোক কমই দৃষ্ট হয়। বর্ম্মাজাতি এখনও তেমন শিক্ষিত হয় নাই, সেই জন্যই পৃথিবীর নানাস্থানের লোক এখানে আসিয়া চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদি করিতেছে। এবং সেই জন্যই আজ ইংরাজ-রাজও তীব্র প্রতিবাদের ভয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন ইচ্ছানুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেছেন।

এই সকল বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন দেশীয়, বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার বা বন্ধুত্ব স্থাপনের উপায়, প্রথম ইংরাজী ভাষা, দ্বিতীয় হিন্দি ভাষা। এই ইংরাজী বা হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়াও এখানে বিদেশীয় লোকদিগের সহিত বেশ বন্ধুত্ব স্থাপন করা যায়। সকলেই প্রায় স্বদেশ ছাড়িয়া আসিয়া সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, উদার ভাবে সকলের সহিত মিশিয়া থাকেন। সাহেবেরাও এখানে এখনও "নেটিভের" উপর সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বর্ম্মারা যদিও বিশেষ শিক্ষিত নয়, তথাপি সাধারণ শিক্ষা (Mass Education) প্রায় সকল ঘরের ছেলে মেয়েই সমানে পাইয়া থাকে। সাধারণ ভাবে লিখিতে পড়িতে জানে না, এমন বর্ম্মা বা বর্ম্মিনী নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও প্রায় দৃষ্ট হয় না। সাধারণ শিক্ষা প্রসঙ্গে গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রামলাল সরকার মহাশয় জাপানের পরই ব্রহ্মদেশের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন, যে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে ইহারা কত দুর অগ্রসর।

রেঙ্গুন সহর ইরাবতী নদীর বিস্তৃত শাখা রেঙ্গুন নদীর কূলে অবস্থিত। রেঙ্গুন হইতে সমুদ্র ২০ মাইল দূরে। কলিকাতার যেমন গঙ্গার এক ধারে কলিকাতা সহর, অন্য দিকে হাবড়া, রেঙ্গুনেও তেমনি নদীর এক তীরে রেঙ্গুন সহর অবস্থিত এবং অন্য তীরের নাম "ডালা।"

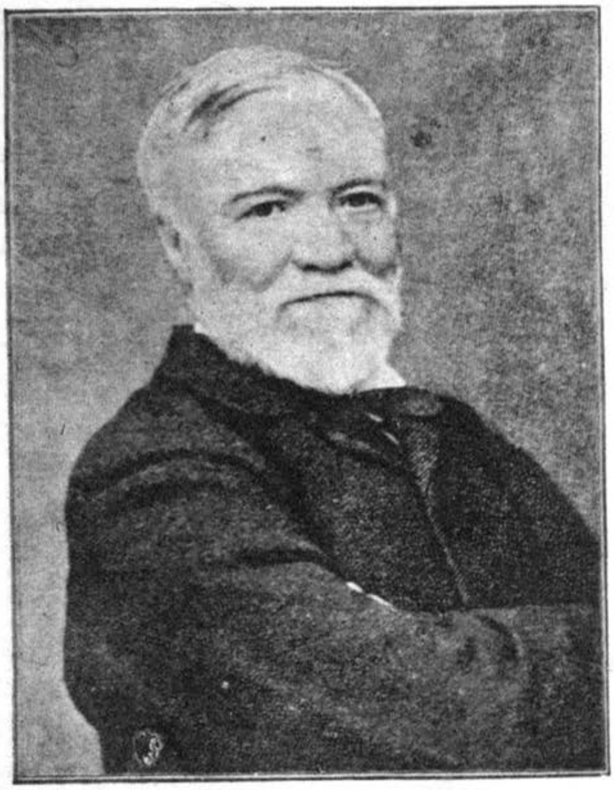
রেঙ্গুন সহরের ঠিক মধ্যে কোন কল কারখানা নাই। এই ডালায় অধিকাংশ কল আছে। আর রেঙ্গুন সহর হইতে পূর্ব্বদিকে নদীর সহরের দিককার তীরে "ডানিড" (Dannidaw) নামক স্থানে নদীর একবারে কূলেও অনেক কল কারখানা আছে। সে সব স্থানে প্রধানতঃ চাউল, কাঠ, কেরাসিন তৈল, মোমবাতি ইত্যাদির কল আছে।

রেঙ্গুন। শ্রীপ্রেমকুসুম রাহা।

দান-বীর কার্ণেগী।

আমেরিকার সুবিখ্যাত ধনী দান-বীর এণ্ড্রু কার্ণেগীর নাম আজ কাল সভ্য জগতের সর্ব্বত্র সুবিদিত। বুদ্ধি ও শ্রমশীলতা প্রভাবে অতি হীনাবস্থা হইতে ক্রোর-পতির পদ এ সংসারে অনেকেই লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কার্ণেগীর ন্যায় সেই স্বোপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার —জগতের সভ্যতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির আয়োজনে সেই অর্থের নিয়োগ—আর কোন ক্রোরপতি এরূপ ভাবে করিয়া গিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। মানব-জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর, জীবনে উপার্জ্জিত নশ্বর ধন সম্পত্তিও চিরস্থায়ী নহে; কিন্তু এই ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনে উপার্জ্জিত নশ্বর ধন সম্পত্তি অবলম্বন করিয়া যে মানব এই জগতে শান্তি বিস্তার ও মানব জাতির অক্ষয় অমূল্য জ্ঞান-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করিতে পারেন, তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার অর্থোপার্জ্জন সার্থক, আর তাঁহার অর্থরাশিও সার্থক।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ড দেশে কার্ণেগী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সামান্য তন্তুবায়ের কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া জনসাধারণের নিকট তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তিও ছিল। তাঁহার মাতা এক জন সুনিপুণা, পরিশ্রমশীলা, মিতব্যয়ী রমণী ছিলেন। কার্ণেগীর ১০ বৎসর বয়সের সময় স্কটলণ্ডে হাতে বোনা তাঁতের সহিত



এণ্ড্রু কার্ণেগী।

২৩২(A)

নবনারী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৮)

গুণৌর-রাণী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ভূপাল রাজ্যের একাংশে গুণৌর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দোস্তমোহম্মদ নামক আওরঙ্গজেবের জনৈক বিচক্ষণ সেনাপতি ঐ গুণৌর রাজ্যের পার্শ্বে ভূপাল নামে এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর দোস্তমোহম্মদ গুণৌর রাজ্যের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাও স্বাধিকারভুক্ত করিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। দোস্তমোহম্মদ আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সসৈন্যে গুণৌর রাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় পঁহুছিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক গুণৌর নগর অধিকার করিলেন। তৎকালে গুণৌর-রাণীর অনিন্দ্য রূপমাধুরীর খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দ্রিয়বিলাসী দোস্তমোহম্মদ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া আপনার পাপলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য রাণীর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। রাণী দোস্তমহম্মদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া সাজ সজ্জার জন্য দুই ঘণ্টা সময় চাহিলেন। রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর উদ্বাহ-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। রাণী বিজয়ী বীরের সজ্জার জন্য একটি মনোহর পোষাক ও মণিমুক্তার নানাবিধ আভরণ প্রেরণ করিলেন। দোস্তমোহম্মদ এই সকল রমণীয় বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে যথা সময়ে ছাদের উপরে রাণীর সন্নিধানে গমন করিলেন। রাণীর অতুল রূপরাশি নবাবের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন, তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হইল যে, জনশ্রুতি সে সৌন্দর্য্যরাশির বর্ণনায় অক্ষম হইয়াছে। তখন তিনি বিগলিত হৃদয়ে রাণীর সহিত মধুর বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই তাঁহার দেহে অসহ্য জ্বালা আরম্ভ হইল, পাখা ও পানীয় জল আনীত হইল। কিন্তু দেহের জ্বালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নবাব বরসজ্জা ছিন্ন করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। নবাবকে তদবস্থায় দেখিয়া তেজস্বিনী রাণী দৃঢ় স্বরে বলিতে লাগিলেন, "খাঁ, জানিও তোমার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে। আমাদের বিবাহ ও মৃত্যু এক সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইবে। তোমার পরিহিত এই পরিচ্ছদ বিষাক্ত, আমার পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া আমি এই কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি।" এই তেজোপূর্ণ বাক্যে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তে রাণী উল্লম্ফন প্রদান পূর্ব্বক প্রাসাদের পার্শ্ববাহিনী নর্ম্মদা-গর্ভে পতিত হইয়া ইহজীবনের শেষ করিলেন। অতঃপর দোস্তমোহম্মদ যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।*

(৯)

কৃষ্ণাকুমারী।

বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৃষ্ণাকুমারী ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কৃষ্ণাকুমারী উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা। কৃষ্ণাকুমারী অনুপম রূপ-লাবণ্যময়ী ছিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রূপমাধুরী খেলিয়া বেড়াইত; তাঁহার আচার ব্যবহারে এরূপ একটি অপূর্ব্ব মহিমাময়ী ভঙ্গী দেখা যাইত, যাহা ছোট বড় সকলকেই মুগ্ধ করিত। বস্তুতঃ কৃষ্ণাকুমারী যথার্থই রাজপুত-কুলেরকুসুম সদৃশ ছিলেন। প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ম্যালকম সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, 'কৃষ্ণাকুমারী আলোকসামান্য রূপবতী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ যৌবনসিংহকে দেখিয়াছি। এই রাজকুমারের সহিত রাজকুমারী কৃষ্ণার আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ছিল। যৌবনসিংহের বর্ণ সুগৌর, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুন্দর ও সুগঠিত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটি কোমল শ্রী দীপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সুন্দর বদন তীক্ষ্ণ ও তেজস্বিতার

* মাননীয় লেখক মহাশয় রাণীর যতই প্রশংসা করুন না কেন, আমাদের মনে হয়, ইঁহার ছলনা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যবহার কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে। ভাঃ মঃ সঃ।

পরিচায়ক।' যাহা হউক, যোধপুরাধিপতি এই রাজপুত-ললনা-কুসুমের পাণিপ্রার্থী হইলেন, রাজা ভীমসিংহও আহ্লাদ সহকারে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শুভপরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই যোধপুরাধিপতি অকালে পরলোক গমন করিলেন। অতঃপর রাণা ভীমসিংহ জয়পুরের মহারাজ জগৎ রায়ের সহিত স্বীয় দুহিতা-রত্নের বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। এ দিকে যোধপুরাধিপতির উত্তরাধিকারী মহারাজ মানসিংহও কৃষ্ণাকুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলেন। ফলতঃ কৃষ্ণাকুমারী-রূপ অপরূপ রত্নলাভের জন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রণক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই রাণা অপেক্ষা বলশালী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই আপন শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, এবং কৃষ্ণাকুমারীর হস্ত লাভ করিতে অসমর্থ হইলে সমরানল প্রজ্বলিত করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। মহারাণা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন, কাহাকে উপেক্ষা করিয়া কাহার হস্তে কৃষ্ণাকুমারীকে অর্পণ করিবেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া নীরব রহিলেন। ইহাতে জগৎরায় ও মানসিংহ উভয়েই অসন্তুষ্ট হইয়া উদয়পুর রাজ্যের সামান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এই সকল সৈন্য রাণার রাজ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত দেশ ছারখার করিতে লাগিল। বলহীন মহারাণা এই দৌরাত্ম্যের প্রতিরোধ করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার রাজগৌরব সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, তাঁহার অপত্যস্নেহ ক্ষুণ্ণ হইল। তিনি বিপদ হইতে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। তাদৃশ বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিবার একমাত্র ভয়াবহ উপায় দেখা দিল; সে উপায় সমস্ত বিপদের মূলীভূত কারণ কৃষ্ণাকুমারীর অপসারণ, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যোধপুর ও জয়পুরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া রাজ্যমধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা। শোণিত-লোলুপ মন্ত্রী আমীর খাঁ মহারাণাকে এই উপায় অবলম্বন করিবার জন্য কুমন্ত্রণা দিলেন। এই লোমহর্ষণকর প্রস্তাবে মহারাণা শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার স্নেহশীল হৃদয় ব্যথিত হইল। পরিশেষে বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণাধিকা দুহিতার প্রাণহরণে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কুসুম-কোমল কৃষ্ণাকুমারীর পবিত্র রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিবার উপযুক্ত নির্ম্মম লোক পাওয়া দুর্ঘট হইল। মহারাণা স্বীয় আত্মীয় মহারাজ দৌলতসিংহকে এতৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এই লোমহর্ষণকর প্রস্তাব শুনিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'যে জিহ্বা হইতে এরূপ প্রস্তাব বাহির হয়, সে জিহ্বাকে ধিক্! আর যদি বন্ধুতা রক্ষার জন্য এইরূপ কাজে লিপ্ত হইতে হয় তবে সে বন্ধুতাতে ধূলি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে।' মহারাণা তখন আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ধরিয়া বসিলেন, এবং এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে কাতর ভাবে অনুরোধ করিলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া স্বীকৃত হইলেন; কৃষ্ণার প্রাণনাশের জন্য তরবারি হস্তে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই সময় নিষ্পাপমতি অবলা নিদ্রিতা ছিলেন; তদীয় পিতৃব্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে "শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া দিয়াছে।" সে প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যে সমগ্র গৃহ আলোকিত হইয়াছে। এ দৃশ্যে তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আহত হইয়া উঠিল, তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। অতঃপর মহারাণার দুরভিসন্ধির বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রাজমহিষী এই আসন্ন বিপদে শোকে দুঃখে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার করুণ বিলাপে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কৃষ্ণাকুমারী নিজে এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া অবিচলিত রহিলেন। তিনি পিতা, পরিবার ও জাতির উদ্ধার কল্পে জীবন বিসর্জ্জন করিতে সংকল্প করিলেন। এবার তরবারির পরিবর্ত্তে বিষ প্রয়োগে তাঁহার জীবন নাশ করিবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল। কৃষ্ণাকুমারী পিতার মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তার পর অম্লান বদনে পিতার প্রেরিত বিষপাত্র মুখে তুলিয়া ধরিলেন। রাজমহিষীর বিলাপ-ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি নানা ছন্দে মহারাণার উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণাকুমারীর চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল না; তিনি ধীর বচনে মাতাকে প্রবোধ

দিতে লাগিলেন; বলিলেন, "জীবনের সকল কষ্টের অবসান হইতেছে, মা, ইহাতে কি জন্য শোকে কাতর হইতেছ? আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি কি তোমার সন্তান নই? আমি কেন মৃত্যুকে ভয় করিব? আমরা জন্মাবধি বলির জন্য চিহ্নিত হইয়া থাকি। আমরা ইহলোকে আসিতে না আসিতেই পুনর্ব্বার পরলোকে প্রেরিত হই। আমি যে এত দিন জীবিত রহিয়াছি তজ্জন্য পিতাকে ধন্যবাদ।" এই ভাবে মাতাকে প্রবোধ দিয়া কৃষ্ণা মৃত্যুর জন্য প্রস্তত হইলেন। কিন্তু বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে বহু বিলম্ব হইল, এজন্য কৃষ্ণাকুমারী আর দুই পাত্র বিষ নিঃশেষ করিয়া পান করিলেন। অতঃপর বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল, রাজপুত কুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িল। (সমাপ্ত)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

অপূর্ণ সাধ।

আজকে কিন্তু আমাকে মা সাজিয়ে দিতে হ'বে;
নিতুই বল 'আজ হবে না', 'জ্বর হয়েছে আজ নারি মা',
সাজিয়ে দেব ভাল ক'রে আরাম হ'ব যবে।
আজকে কিন্তু আমাকে মা, সাজিয়ে দিতে হ'বে।

আজ যে রমার বিয়ে মা! সবাই সেজে যাবে;
মোহন, ধীরেন, মনোরমা, সরোজকুমারী, স্নেহ, উমা,
তুমিই শুধু আমাকে মা, সাজিয়ে নাহি দিবে!
আজ যে রমার বিয়ে মা! সবাই সেজে যাবে।

করে দে মা ভাল ক'রে মনের মতন সাজ;
সবাই পরে রঙিন শাড়ী, যাবে মা আজ কনের বাড়ী,
আমি কি মা এই কাপড়ই থাকবো পরে আজ?
ক'রে দেমা ভাল ক'রে মনের মতন সাজ।

খোঁপা বেঁধে দে মা সোনার ফুল চিরুণী দিয়ে,—
কৌটা থেকে কাঁটা দিয়ে, আগের মতন সিন্দুর নিয়ে,
দিয়ে দে,মা সিঁথের মাঝে, সন্ধ্যা এলো হ'য়ে!
খোঁপা বেঁধে দে মা সোনার ফুল চিরুণী দিয়ে।

সোনার বালা, সোনার চুড়ি, দে পরিয়ে হাতে;
জসম, তাবিজ, কণ্ঠমালা, যার তিন নর গাঁথা পলা,
পরাগো মা থাকৃতে বেলা, যাব সবার সাথে।
সোনার বালা, সোনার চুড়ি, দে পরিয়ে হাতে।

সাধ্‌ছি এত হাতে ধ'রে তবুও কেন মাগো,—
চুপটি করে বালিস বুকে, চোখ নামিয়ে মাটির দিকে,
বোসে আছ হাত দে মাথায়, সাড়া দিচ্ছনাকো?
সাধ্‌ছি এত হাতে ধ'রে তবুও কেন মাগো?

মা! আগে ত গো এমন ধারা ছিলে না মা তুমি।
তখন কত যতন ক'রে, সাজিয়ে দিতে নিতুই মোরে,
এখন নাহি দাও সাজিয়ে, কেঁদে মলে(ও) আমি!
মা! আগে ত গো এমন ধারা ছিলে না মা তুমি!

জানি না মা ওমাস থেকে তোমাদের কি হ'লো!
একটী কথাও নাহি শুন, বাবাও কথা কন্‌না কোন,
এখন বুঝি আমাকে মা আর বাস না ভালো?
জানি না মা ওমাস থেকে তোমাদের কি হলো!

গায়ে ছিল যে সব গহনা, খুলে কেন নিলে?
তা' হ'লে ত আজকে তোমায়, হ'ত নাক' সাধতে আমায়,
মজা ক'রে বিয়ে বাড়ী কখন যেতেম চলে!
গায়ে ছিল যে সব গহনা, খুলে কেন নিলে?

বুঝেছি গো তোমরা আমায় দেখ্‌তে নারো আর!
নইলে কেন গহনা খুলে, মাথার সিন্দুর মুছে দিলে?
পরা'লে গো সাদা কাপড় দেখ্‌তে কদাকার?
বুঝেছি গো তোমরা আমায় দেখ্‌তে নারো আর!

সাধে কি মা তোদের উপর যাইগো আমি চটে!
আগে কেমন বাবার সাথে, মাছের মুড়ো পেতুম খেতে,
বাড়ীতে গো এখন কেন মাছ আসে না মোটে?
সাধে কি মা তোদের উপর যাই গো আমি চটে!

যাই হ'ক মা, আজকে কিন্তু সাজিয়ে দিতে(ই) হবে!
নইলে গো পা'য় মাথা খুঁড়ে, পা'র উপরে থাকবো প'ড়ে,
খাবার দিলে ফেলে দেব, ডাকবে খেতে যবে।
যাই হ'ক্‌ মা আজকে কিন্তু সাজিয়ে দিতে(ই) হবে!

শ্রীমৃন্ময়ী দেবী।

২৩৬

৺ধানকোর বাই মাধোদাস।

পরলোকগতা ধানকোর বাই মাধোদাস, বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্ত বণিক মাধোদাস রঘুনাথ দাসের পত্নী ছিলেন। এ অঞ্চলে ইনি উন্নত-চরিত্রা ও অতি কোমল-হৃদয়া মহিলা বলিয়া খ্যাত। নিজ স্নেহ ও উদার অন্তঃকরণ দ্বারা ইনি পারশী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্র, হিন্দু ও খৃষ্টান-নির্ব্বিশেষে বহু পরিবারকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-সূত্রে নিজ পরিবারের সহিত গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার এই উদার প্রেম, বালিকা-সুলভ স্নেহ ইঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। কিন্তু এই প্রবীনা মহিলার প্রেম কিরূপে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কিরূপে স্বকীয় জাতি ও সমাজের সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে ইঁহার দুঃখময় জীবনের অতীত কাহিনী স্মরণ হয়, এবং মনে হয়, ইনি নিজে বড় দুঃখী ছিলেন, তজ্জন্যই ইনি প্রেমের মূল্য বুঝিয়াছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই অকাতরে ভেদাভেদ রহিত হইয়া সকলকে স্নেহ দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ধানকোর বাই যৌবনের প্রারম্ভেই বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হন, পরে মাধোদাসের সহিত ইঁহার পুনর্ব্বিবাহ হয়। এই বিবাহের পূর্ব্বে প্রথম বৈধব্যাবস্থায় ইঁহার জীবন বড়ই দুঃখময় ছিল। স্বামী যাহা কিছু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন ইনি তাহার কিছুই পান নাই। সুতরাং তিনি তাঁহার ভ্রাতৃগৃহে ভ্রাতৃজায়া ও মাতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃই বৈধব্যদশা কঠোর হইয়া উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধা মাতার মৃত্যুর পর নিজের দশা কি হইবে, ভাবিতে লাগিলেন। হয়ত দুটী ভাতের জন্য ভাতৃজায়া বাক্য-যন্ত্রণা দিবেন, এই দুঃখময় জীবনে সে যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করিবেন—ইত্যাদি চিন্তা ধানকোরের প্রাণকে অতিশয় অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি ভাবিলেন, এ জগতে কাহার জন্য, কিসের আশায় আমি বাঁচিয়া আছি? আমার ভবিষ্যত ত অধিকতর দুঃখযন্ত্রণাময়। এইরূপ চিন্তার পর ধানকোর আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু জানিতেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যা হইতে ক্ষান্ত হইলেন, ভাবিলেন, অনাহারে মরিবেন। তদনুসারে দৈনিক আহার বন্ধ করিলেন, সামান্য কিছু নামমাত্র ভক্ষণ করিতেন। তদ্দ্বারা দুঃখের মাত্রা বর্দ্ধিতই হইল। ইনি হিষ্টেরিয়া রোগাক্রান্ত হইলেন।

এ স্থলে মাধোদাসের বিষয় দু চারটী কথা বলা প্রয়োজন। মাধোদাস রঘুনাথ দাস ইতিপূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে তিন বার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তৃতীয় স্ত্রীও একটী অল্পবয়স্কা শিশু কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তখন মাধোদাসের বয়স ৪১ বৎসর। উপর্য্যুপরি এইরূপ দৈববিপাকে মাধোদাস সংসারে উদাসীন ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন, মনস্থ করিলেন, কোনরূপে শিশু কন্যাটীকে পালন করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইয়া ঈশ্বরের কার্য্যে মন নিয়োগ করিবেন, আর বিবাহ করিবেন না। কিন্তু বিধির ব্যবস্থা ছিল অন্যরূপ।

মাধোদাস উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই, কিন্তু তিনি সচ্চরিত্র, সহৃদয় ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। পত্নী বিয়োগে মাধোদাসের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন মাধোদাস কিছু দিনের জন্য বোম্বাইয়ের সমুদ্র-তীরস্থ ওয়ালকিশোর নামক স্থানে গমন করেন। এখানে ধানকোর বাই তাঁহার ভ্রাতার গৃহে ছিলেন। মাধোদাস ধানকোর বাইয়ের মাতার সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে সামান্য দূর-সম্পর্কও ছিল। মাধোদাস ধানকোরের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, বৃদ্ধা তখন গৃহে ছিলেন না। মাধোদাস দেখিলেন, ধানকোর হিষ্টেরিয়ার আক্রমণে অতিশয় ক্রন্দন করিতে-ছেন। তাঁহার নিকটে একজন পরিচারিকা। ধানকোর কথা বলিতে সক্ষম হইলে মাধোদাস তাঁহার শারীরিক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধোদাস নিজে ভুক্তভোগী ছিলেন, সুতরাং বিধবা ধানকোরের শারীরিক পীড়ার প্রকৃত কারণ কি তাহা তিনি বেশ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি ধানকোরকে বুঝাইয়া বলিলেন, যে মনের প্রফুল্লতা ও মুক্ত বাতাস সেবন দ্বারা এ পীড়া আরোগ্য হইয়া যাইবে। ধানকোর তদুত্তরে বলিলেন, এ সংসারে আমার কি সুখ, কি আশা আছে, যাহার জন্য

২৩৬



ধানকোর বাই মাধোদাস।

এ শরীরকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিব? বরং যদি অনাহারে, ক্লেশে এ দেহ নাশ হয় তাহাতে আমি সুখী। ভগবান আমাকে একটী সন্তানও দেন নাই যাহার মুখ দেখিয়া এ দুর্ব্বিসহ জীবনের ভার বহন করিব।

মাধোদাস বিধবার মানসিক ও শারীরিক শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মুহ্যমান হইলেন। তিনি নিজে শোকার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি বিধবার মর্ম্মভেদী বাক্যের মর্ম্ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি ধানকোরকে ধৈর্য্যধারণ ও ঈশ্বরে নির্ভর করিতে উপদেশ দিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মাধোদাস "সত্য প্রকাশ" নামক পত্রিকায় বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুক্ত করসান্‌দাস মূলজীও এ অঞ্চলের একজন সুবিখ্যাত উৎসাহশীল সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। রাত্রিতে মাধোদাস উদ্বিগ্ন হৃদয়ে নিদ্রার আশায় শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিধবার দুঃখে তাঁহার দুঃখিত ও সন্তপ্ত প্রাণ আজ অধিক তপ্ত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা হইল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আজ পর্য্যন্ত এই সকল সামাজিক অন্যায়াচরণ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কাগজে ত কত লেখালেখি করিলাম, কিন্তু হায়, আমাদের সমাজ ত চিরস্থিরই রহিল। কোনও উন্নতি, কোনও ফলই হইল না। আমাদের দেশের অনাথা বালিকা বিধবাদিগের আজন্ম কঠোর দুঃখ দুর করিবার ত কোন পথই হইল না! ইহাদের জন্য জীবন দ্বারা ত কোন স্বার্থত্যাগই করিলাম না। স্বার্থত্যাগ ভিন্ন ভবিষ্যৎ এমনই যন্ত্রণাময় থাকিবে। আমাদের মধ্যে কাহাকেও নিজ জীবন দ্বারা এ দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। ইহার জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ, লোক-গঞ্জনা ও কষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে।'

এইরূপ মনস্থ করার পর মাধোদাস "রাষ্ট গোফ্‌টার"* (Rast Goftar) নামক পত্রিকায় এই মর্ম্মে এক বেনামি বিজ্ঞাপন দেন ;—"আমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত, ভদ্রবংশীয়া এমন একটী বিধবাকে যে কেহ দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৫০০৲ পুরস্কার দিব।" বলিতে ভুলিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে মাধোদাসের বিবাহের জন্য অনেকে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। এমন কি বিংশতি বর্ষীয়া এক কুমারীর জন্যও প্রস্তাব আসিয়াছিল, কিন্তু মাধোদাস কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করেন নাই। কারণ, তিনি আর বিবাহ করিবেন না, এরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন।

মাধোদাস বিজ্ঞাপনের কোনও উত্তর পাইলেন না। কিন্তু সকলেই বুঝিলেন, যে মাধোদাস ভিন্ন এরূপ লজ্জা-ধর্ম্মহীন বিজ্ঞাপন আর কেহই দেয় নাই।

এদিকে ধানকোর বাই আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করায় তাঁহাদের পরিচিত ইংলণ্ড-প্রত্যাগত এক যুবক ধানকোরকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করেন এবং ধানকোরকে পুনর্ব্বিবাহ করিবার জন্য নানারূপ পরামর্শ দেন। প্রথমতঃ ধানকোর ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু পরে মাধোদাস বিধবাবিবাহ করিতে সম্মত আছেন জানিয়া, তিনি সে বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ধানকোর মাধোদাসকে জানিতেন। তিনি জানিতেন, মাধোদাস অতি সহৃদয় পুরুষ। অনেক চিন্তার পর ধানকোর বাই মাধোদাসকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাঁহার মাতা বিধবার পুনর্ব্বিবাহকে অতি হেয় বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু তাঁহার অনেক মহিলা বন্ধু তাঁহার সহায় হইলেন। মাধোদাস এই সম্বন্ধ স্থির করিয়া পরম সুখী হইলেন। কারণ, ভবিষ্যতের গভীর অন্ধকারে যে আলোকময় দিবস লুক্কায়িত ছিল, তাহা আজ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল, তিনি নিজ জীবন দ্বারা সেই অন্ধকার দূর করিতে প্রয়াস পাইলেন, বহু ক্লেশ, উৎপীড়ন সহ্য করিয়া এই পথ অনুসরণের জন্য অপরের সম্মুখে আদর্শ দেখাইতে পারিবেন, এই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয়ে গভীর আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইল।

বিবাহের পর হইতে ধানকোরের জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। যেমনি দুঃখী ছিলেন বিধাতা তাহার সহস্রগুণ সুখ দিলেন। ইনি হৃদয়বান পতি প্রাপ্ত হইয়া পরম সম্পদশালিনী সৌভাগ্যবতী রমণী হইলেন, সর্ব্ব-

* পূর্ব্বলিখিত সত্যপ্রকাশ পত্রিকা পরে Rast Goftarএর সহিত মিলিত হইয়া যায়।

বিষয়ে স্বামীর সহচরী হইলেন। নিজ গৃহে হিন্দু, খৃষ্টান, প্রভৃতি জাতি ও সমাজ নির্ব্বিশেষে বন্ধুবান্ধবের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। শুধু অভ্যর্থনা কেন, স্বভাবসুলভ অথবা অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত প্রীতি দ্বারা তিনি খৃষ্টান মহিলা-দিগকেও নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয়ের ন্যায় স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মাধোদাসও উপযুক্ত পত্নী লাভ করিয়া বিবাহের পর হইতে অধিক উৎসাহী হইলেন। তিনি মহৎ কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া দুঃখী অনাথা বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ দিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, যে তজ্জন্য তাঁহাকে যে লাঞ্ছনা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তত ছিলেন। ধানকোর ইহাতে স্বামীর যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বিধবাদের বিবাহ দিবার স্থানাভাব হইত বলিয়া মাধোদাস নিজ বর্ত্তমান গৃহের পশ্চাতে বিধবাদের বিবাহ দিবার জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া যান। তাহা এখনও Widow Remarriage Hall (বিধবাবিবাহ মন্দির) বলিয়া খ্যাত আছে। তদ্ভিন্ন বিধবা ফণ্ডে যথেষ্ট অর্থ দান করেন।

ধানকোর এক পুত্র ও এক কন্যা লাভ করেন। তিনি ইহাদের অতি স্নেহময়ী মাতা ছিলেন। সন্তানদিগকে তিনি প্রেমে ও সুশিক্ষায় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইঁহারা পিতা মাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্ততিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ধানকোর নিজ পুত্রবধূকে কন্যা-স্নেহে চিরদিন প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। নিজ কন্যা ও পুত্রবধূ যাহাতে ইংরাজী এবং গুজরাটী ভাষা, সঙ্গীতবিদ্যা ও সূচীকার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা করে, তজ্জন্য যথেষ্ট যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, ধানকোর গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে অবস্থিতা ছিলেন। তাঁহার প্রেমের শাসনে তাঁহার পরিবার আদর্শ পরিবারে পরিণত হইয়াছিল। নিজ কন্যা ও পুত্রবধূকে তিনি সর্ব্ববিষয়ে সমতায় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। অনাথা বিধবাদিগকে তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ ও পিতার ন্যায় ভরণপোষণ করিতেন। ইনি গৃহকার্য্যে সুনিপুণ এবং আয়ব্যয়ে মিতাচারী এবং দূরদর্শী ছিলেন। অভ্যাগতের জন্য ইঁহার গৃহ বোম্বাই সহরে প্রসিদ্ধ ছিল। পরিচিত অপরিচিত সকলকেই ইনি সহাস্যবদনে আতিথ্য দানে মুগ্ধ করিয়াছেন। গৃহে যখন প্রায় সকলে অসুস্থ, চাকর চাকরাণীও নাই, তখনও দেখিয়াছি, বৃদ্ধা ধানকোর শান্ত ও প্রফুল্ল চিত্তে একদিকে রোগীর সেবা ও অপর দিকে উপস্থিত বন্ধুদের অভ্যর্থনা করিতেছেন। ইনি ধৈর্য্যে বিভূষিতা ছিলেন। আমি যখনই ইঁহার গৃহে গিয়াছি তখনই ইনি ইঁহার পরিচিত কলিকাতাস্থ বাঙ্গালী বন্ধুদের পরিবারের বিষয় কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। বাস্তবিকই ইনি অমায়িকতা ও উদার স্নেহের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। সচরাচর দেখিতে পাই, প্রাচীন স্ত্রীলোকগণ কিরূপ কুসংস্কারাপন্ন, মহিলাগণের মন কিরূপ সঙ্কীর্ণ। নিজের গৃহে আত্মীয় ভিন্ন অন্যের হিতাহিত কামনা, দেশ বা সমাজের কল্যাণ-চিন্তা, তাঁহাদের অন্তরে দেখা যায় না বলিলেই চলে; কিন্তু এই প্রাচীনা মহিলা সমুদয় প্রাচীন সদ্‌গুণের সহিত পাশ্চাত্য অনেক উন্নত সংস্কারে উন্নতা ছিলেন। ইনি বৃদ্ধাবস্থায়ও অতি উৎসাহী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরও ইনি নির্ভীক হৃদয়ে স্বপুত্রের সাহায্যে অনেক বিধবার বিবাহ দিয়াছেন। দূর দূরান্তর হইতে বিধবাগণ ইঁহার গৃহে আগমন করিয়া আশ্রয় ও স্নেহ লাভ করিয়াছে এবং পাত্রস্থ হইয়াছে। ইনি জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে কেহই হউক না কেন, ইনি নিজ গৃহে সকলের সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতেন। অপর দিকে ইংরাজ খৃষ্টান মহিলা দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের গৃহে যাইয়াও আহারাদি করিয়াছেন। আমাদের দেশের মহিলাগণ, এমন কি শিক্ষিতা মহিলারাও অল্প বয়সেই উৎসাহহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়েন, যেন কিছুই শিখিবার, করিবার নাই। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে ইঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। অসুস্থ শরীরেও ইনি গত-পূর্ব্ব বৎসরে বেনারস কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ধানকোর গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইহলোক ত্যাগ

করেন। ইঁহার নয় দিন পূর্ব্বে ইঁহার পুত্রবধূ সূতিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। বোম্বাই হাইকোর্টের সুবিখ্যাত জজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রাবরকারের পত্নী ও অন্যান্য যাঁহারা সর্ব্বদাই ইঁহার অসুস্থাবস্থায় নিকটে থাকিতেন তাঁহারা বলেন, যে পুত্রবধূর মৃত্যুর পর হইতে ইনি ঔষধ পথ্যাদি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন। নিজের অসুস্থতার উপর পুত্রবধূর মৃত্যু এবং মাতৃহীন ছোট ছোট পৌত্র-পৌত্রীদিগের অবস্থা ভাবিয়া ধানকোর বড়ই শোকার্ত্ত হইয়া পড়েন। আর রোগমুক্ত হইয়া উঠিতে পারিলেন না।

বিধবাবিবাহ ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে অনেকের সঙ্গেই তাঁহার মত-পার্থক্য ছিল, কিন্তু তাঁহার উন্নত চরিত্র, তাঁহার উদার হৃদয়, তাঁহার প্রবল দেশানুরাগ ও কর্ম্মশীলতার প্রশংসা করে না, এরূপ লোক এ অঞ্চলে বিরল। বস্তুতঃ এই মনস্বিনী রমণীকে হারাইয়া বোম্বাই প্রদেশ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সুদূর বঙ্গে থাকিয়া ভারত-মহিলার পাঠক পাঠিকাগণের পক্ষে তাহা অনুভব করা কঠিন।

বোম্বাই। শ্রীকুমুদিনী গান্ধি।

নুরজাহান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অশ্রুপ্লাবিত নয়নে বেগম-গীয়াস বলিলেন, মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞী! এ সংসার অতি পাপপূর্ণ, সুনির্ম্মল চরিত্র-কুসুম মুহূর্ত্তের মধ্যে পাপ-সংস্পর্শে মলিন হইয়া যায়। পার্শ্বের গৃহে আমার কন্যা বিশ্রাম করিতেছিল, শাহাজাদা সেলিম গোপনে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখি, উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। পবিত্র সতীত্ব-কুসুম একবার বৃন্তচ্ছিন্ন হইলে আর কখনও ফোটে না। যুবরাজের কর্ত্তব্য, তিনি প্রজা-সাধারণের সম্মুখে সদৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ও রাজ্যের কল্যাণকর ব্যবস্থা করা কেবল আপনারই সাধ্যায়ত্ত।"

মাতৃস্নেহ-বিগলিত হৃদয়ে যোধাবাই বলিলেন, আমার ছেলের এই প্রথম বয়স। যৌবনের প্রভাব দুর্দ্দমনীয়, কিন্তু আমি তাহার হৃদয়ে মহত্বের চিহ্ন দেখিতেছি। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমরা কিছুতেই তাহার এই ব্যবহারে প্রশ্রয় দিব না। নিশ্চয়ই দেশের যুবকদিগের নিকট তাহার কার্য্য আদর্শোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি তাহাকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিয়া দিব। কিন্তু আমার কথা শুনুন, এ কথা যেন আর কাহারো কাণে না যায়, সৌভাগ্য এই যে আপনিই শুধু তাহাদিগকে একত্রে দেখিয়াছেন।"

কুর্ণিস করিয়া বেগম-গীয়াস বলিলেন, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন।"

যোধাবাই। এই প্রকার নির্ব্বোধোচিত ব্যবহারের জন্য সেলিম অবশ্যই ক্ষতিপূরণ করিবে, কিন্তু সাবধান, কথাটা গোপনে রাখিতে হইবে।

বেগম-গীয়াস। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আপনি সর্ব্বদাই আমার প্রতি কৃপাময়ী। নিন্দুকের কু-রসনার আক্রমণ হইতে আমার কন্যার সম্মান রক্ষার জন্যই আপনি আমাকে সতর্ক করিতেছেন।

যোধাবাই। সম্রাট খবর পাঠাইয়াছেন, তিনি অপরাহ্নে আমাদের উৎসব দেখিতে আসিবেন।

বেগম-গীয়াস। তাহা হইলে আমরা এখন আসি, আপনি নিশ্চয়ই এখন অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন।

যোধাবাই। হাঁ, উৎসব যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় আমাকে এখন তাহার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে, আপনারা তবে এখন আসুন।

বেগম-গীয়াস আবার কুর্ণিস করিয়া শ্রদ্ধাভরে সম্রাজ্ঞীর হস্ত চুম্বন করিলেন, কিন্তু তিনি ফিরিতে না ফিরিতেই মিহর-উল-নিশা জানু পাতিয়া সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে উপবেশন করতঃ বলিতে লাগিল :—

"মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞী, দয়া করিয়া দীনার প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন; আমি জানি, আপনি নিশ্চয়ই আমার পিতামাতার ন্যায় আমার প্রতি কঠোর হইবেন না। আপনার পুত্র আমাকে সত্য সত্যই ভালবাসেন,—অন্তরের সহিত ভাল বাসেন"—তৎপরে মস্তক অবনত

করিয়া ভূতলে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল, "আমিও তাঁহার প্রেমের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করি নাই। প্রথম দর্শনেই আমাদের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই দিনই আমি তাঁহার সঙ্গে পরিণীতা হইতে বাক্য দান করিয়াছি। শাহাজাদা জোর করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হন নাই—আমার যা প্রকৃত কথা জানেন না, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, এই জন্য তিনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী, আপনি ভালবাসার মর্ম্ম জানেন, আশা করি আপনি আমার এই অবালিকোচিত ব্যবহার মার্জ্জনা করিবেন; আমি যুবরাজকে ভালবাসি, আপনি যুবরাজের জননী—তাঁহার সুখ দুঃখের প্রতি আপনি উদাসীন হইতে পারেন না—আমার পিতা মাতা আমাদিগকে যে ঘোর দুঃখে নিক্ষেপ করিতে চাহিতেছেন আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে সেই চির দুঃখের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। আপনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী, আপনার নিকট আমার এই সকাতর প্রার্থনা। আমার পিতামাতা আমায় অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন—আমি তাঁকে জানি না, আমার পক্ষে তাঁকে ভালবাসা অসম্ভব, কারণ আমার হৃদয় এখন আর সকল পুরুষের প্রতিই অবরুদ্ধ। আপনি চির দিনই আমার পক্ষে মাতৃস্বরূপা হইয়া রহিয়াছেন, আমাকে কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেছেন, দোহাই আপনার, আমার পিতামাতা আমার জীবন, আমার সকল সুখশান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে চাহিতেছেন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

বেগম-গীয়াস বিস্মিত, স্তম্ভিত, এবং ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন, অশ্রুজলে ভাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় হতভাগী, তোর পিতা মাতা গরিব বটে, কিন্তু তারা সৎ; কেন তুই পৃথিবীতে আসিয়াছিলি, কেন তুই তাহাদিগের মুখে এই কলঙ্ক কালি ঢালিয়া দিলি?"

মিহরের উক্তি শুনিয়া যোধাবাইয়ের হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, শান্তভাবে তিনি বলিলেন, "বেগম-গীয়াস, উতলা হইবেন না। হৃদয় যখন পূর্ণ থাকে তখন মানুষ বাহিরের সামান্য লৌকিকতা ভুলিয়া যায়। মন খুলিয়া মিহর তাহার মনের কথা আমার নিকট বলিয়াছে, এজন্য আপনি রাগ করিতেছেন কেন? এতে দোষ কি? মিহর কি আমার কন্যা নয়? আপনি কিন্তু অন্যায় করিতেছেন! প্রকৃত ভালবাসা কেমন আপনি বুঝি তাহা জানেন না?"

গর্ব্বের সহিত বেগম-গীয়াস উত্তর করিলেন, শৈশবে আমার বিবাহ হয়, তদবধি আমি স্বামীর প্রতি অনুরক্ত, রমণীর ভালবাসা আর কি প্রকার হইতে পারে?"

যোধাবাই বলিলেন, "তাতেই ত আপনি মিহরের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন না! মায়ের ন্যায় তাহার সহিত ধীর ভাবে ব্যবহার করুন, দেখিবেন মঙ্গল হইবে। আমার উপর এবিষয়ে সকল ভার দিন্।" তৎপর মিহরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিয়া তুমি ভালই করিয়াছ। তোমার কাজ আমারই কাজ। এখন শান্ত হও, ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, তিনি সর্ব্বদা তাঁহার জীবের কল্যাণেরই ব্যবস্থা করেন, তোমার সম্বন্ধেও তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি তোমার কল্যাণ সাধনে অবশ্য মনোযোগী হইব।"

বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে মিহর বলিল, "আমাকে এই আশা—আশা কেন, আমার জীবন-দানের জন্য ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কার দিবেন। আপনি সত্য সত্যই আমার মা, আপনি যাহা করিবেন তাতে নিশ্চয়ই আমার মঙ্গল হইবে।"

বেগম-গীয়াস পুনরায় মহারাণীকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শিবিকারোহণে স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সম্রাটের আগমন সম্ভাবনায় সায়ংকালে উৎসব-ক্ষেত্র আরো মনোহর আকার ধারণ করিল। সহস্র সহস্র স্ফটিকনির্ম্মিত দীপাধারে কুসুম নিকুঞ্জ যেন আলোক-নিকুঞ্জে পরিণত হইল। আলোক বিম্বমালা বক্ষে ধারণ করিয়া শান্ত-সলিলা যমুনা যেন হাসিতে হাসিতে প্রিয়সঙ্গমে ছুটিতে লাগিল। ফোয়ারা হইতে গোলাপ জলের ধারা নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিস্তার

2-80

করিতে লাগিল, আলোকে প্রতিবিম্বিত হইয়া গোলাপ-জলবিন্দুগুলি যেন মুক্তারাজির ন্যায় ভূপতিত হইতে লাগিল। আলোকের মেলা, আলোকের খেলা, চারি দিক আলোক-তরঙ্গে যেন হাসিতে লাগিল।

উৎসব-প্রাঙ্গন জানু পর্য্যন্ত গভীর গোলাপ-স্তূপে আচ্ছাদিত, তদুপরি স্বর্ণনির্ম্মিত মনোহর কোমল জালিকা বিস্তৃত। মণিমাণিক্য-ভূষিতা অপরূপ গোলাপ-সুন্দরীতুল্যা মহিলাগণের পদনিস্পেষণে সেই পুষ্পাস্তরণ হইতে চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল। বাদশাহ ও তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আজ উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা। নৃত্যগীতবাদ্যে উৎসব-ক্ষেত্রে আমোদের স্রোত যেন উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

অবশেষে সম্রাট যোধাবাইয়ের সঙ্গে একটী নির্জ্জন গৃহে উপবেশন করিয়া ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মুখ সমস্তক্ষণ যেন চিন্তাপূর্ণ দেখিতেছি, তোমার উৎফুল্ল হৃদয় আজ কিসে বিক্ষিপ্ত হইল?"

যোধাবাই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বিশেষ কিছু নয়, তবে মনটা যে একটু ভারাক্রান্ত আছে তাহা সত্য।"

অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

যোধাবাই। আপনার নিকট কিছুই ত আমার লুকান নাই, একটী গুরুতর চিন্তায় মনটা ভারাক্রান্ত আছে, আপনি বোধ হয় বিষয়টা মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন।

আকবর। তুমি এমন করিয়া আধখানা কথা আপন মনে রাখিয়া, আধখানা মুখে বলিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ কেন? তোমার বিষণ্ণ মুখ আমি দেখিতে পারি না, কি হইয়াছে খুলিয়া বল।

যোধাবাই হাসিয়া বলিলেন, "সে একটা প্রেমের ব্যাপার।" আকবর বলিলেন, "ও, তুমি বুঝি তবে আমার সঙ্গে একটা তামাসার আয়োজন করিয়াছ?" যোধাবাই বলিলেন, "না তা নয়। আপনি মিহর-উন-নিশাকে দেখিয়াছেন? মির্জা গীয়াসবেগের সেই পরীর মতন সুন্দরী কন্যাটী?"

আকবর বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি বই কি? সেই যে তোমাদের কাছে সে দিন খুব সুন্দর গান গাহিতেছিল, —যাঁর সুন্দর জরির কাজ মীনাবাজারে এত বেশী বিক্রী হয়—তার কথা বলিতেছ?" যোধাবাই বলিলেন, "হাঁ, তারই কথা। সেলিম তাহার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়াছে।"

আকবর। এ তে আশ্চর্য্যের বিষয় ত কিছুই নাই। তার রূপ গুণে মুনিরও মন হরণ করে,—রাণীর মত মেয়ে বটে! এমন পুত্রবধূ পাইলে তোমার আনন্দিত হইবারই কথা, গর্ব্বিত হইবার বিষয়! আমি হৃষ্টচিত্তে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতেছি, নিশ্চয়ই তোমারও সম্মতি আছে?"

যোধাবাই হাসিয়া বলিলেন "আমরা ত বেশ সম্বন্ধ পাকা করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু আরো ত বিবেচনার বিষয় আছে?" আকবর হাসিয়া উত্তর করিলেন, "প্রেমে যখন যথেষ্ট উত্তাপ থাকে তখন তা'তে লৌহ পর্য্যন্ত গলিয়া যায়। তোমার সঙ্গে যখন আমি ভালবাসায় পড়িয়াছিলাম তখন আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে তোমার জাত্যভিমান-গর্ব্বিত পিতামাতা কখন সম্মত হইবেন, এরূপ সম্ভাবনা কি কেহ করিয়াছিল? তথাপি দেখ, প্রেম সকল বাধাই জয় করিয়াছে,—আজ তুমি আমার। তাঁহাদিগের সম্মতিলাভ কি অসাধ্য সাধন নয়? অথচ তাঁহাদের বিরক্তিকর কোন কথা আমাকে কখনও বলিতে হয় নাই, আমার শক্তি সামর্থ্য এবং প্রভুত্বের ভয়ও তাঁহাদিগকে কখনো দেখাইতে হয় নাই। আমি সপ্রেম ব্যবহারে ও আনুগত্য দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলাম। আমি যখন বলিলাম, আমার সুখ শান্তি, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাতে, তখন তাঁহারা কিছুতেই আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না, আমাকে সুখী করিবার জন্য তাঁহাদের সামাজিক পদমর্য্যাদা খর্ব্ব করিতে কাতর হইলেন না। বাস্তবিক, রাজপুতেরা অতি আশ্চর্য্য লোক! একবার যদি তাঁহাদের বন্ধুত্ব লাভ

করিতে পারা যায় তবে সকল ভুলিয়া তাহারা তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবে। তাঁহাদিগকে বন্ধু, সভাসদ ও কুটুম্বরূপে পাইয়া আমি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করি।

যোধাবাই দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার পক্ষে সে কি পরীক্ষাই না গিয়াছে! আমি ত মরিতেই বসিয়াছিলাম। আপনি যদিও আমাকে আশ্বাস দিতেছিলেন, কিন্তু আমার নিকট আমাদের বিবাহ সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। আমি আমার পিতামাতার প্রকৃতি জানিতাম, সুতরাং মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত নিরাশার তীব্র দংশন হইতে মুক্তিলাভের আমি আর কোন পথই দেখিতেছিলাম না। কিন্তু সত্যই প্রেম সর্ব্বজয়ী। তরবারির শক্তি অপেক্ষা প্রেমের শক্তি অনেক অধিক। আপনি যদি আমার পিতামাতার প্রতি আপনার প্রভুত্বের প্রয়োগ করিতে চাহিতেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা "জহর" অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু আপনার প্রেমের নিকট তাঁহারা পরাজিত না হইয়া পারিলেন না।

আকবর। এই বিস্তৃত রাজ্য আমি প্রেমেই শাসন করিতে চাই। আমার প্রজাগণের হৃদয়ে প্রেমশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেই অগ্নিতে আমি তাহাদের মধ্যে যত বিরোধ, যত পার্থক্য, সকল দগ্ধ করিতে চাই। ধর্ম্মে ধর্ম্মে, জাতিতে জাতিতে, বন্ধুতে বন্ধুতে, পিতা পুত্রে যত শত্রুতা সকলই ধ্বংশ করিতে চাই। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি, তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ঈশ্বর এক, তাঁহার অংশী কেহ নাই। প্রেম তাঁহার স্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিবার এক মাত্র পথ তাঁহাকে প্রীতি করা, —যদিও তাঁহার উপাসনার প্রণালী নানাবিধ। ঈশ্বর করুন, তাহারা আমার উপদেশ গ্রহণ করুক, এই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণচিত্ত, ভ্রান্তিপূর্ণ প্রজামণ্ডলী এক অবিভক্ত ভারতীয় মহাজাতিতে পরিণত হউক।

যোধাবাই। ঈশ্বর আপনার কামনা পূর্ণ করুন। জাতি সমূহের ভাগ্য-বিধাতা ভগবান্ সকল জাতিরই নিয়তি দর্শন করিতেছেন, আপনি যে ক্ষুদ্র বীজ রোপণ করিয়াছেন তিনি যথাকালে নিশ্চয়ই তাহাকে মহামহীরুহে পরিণত করিবেন।

বিমর্ষ বদনে আকবর উত্তর করিলেন, "কিন্তু তথাপি সময় সময় আমার মনে হয়, আমি যাহা করিলাম, সকলই বুঝি বৃথা! যেন কোন দুষ্ট নিয়তি এই হতভাগ্য দেশের ভাগ্য-রশ্মিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে! এই দুষ্ট নিয়তিই যেন বুদ্ধদেব, জোরাস্তার, শ্রীকৃষ্ণ এবং শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহাপুরুষদিগের কার্য্য পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে।

যোধাবাই। না না, বিধাতার রাজ্যে কিছুই নষ্ট হয় না। যাহা পাপ, যাহা অন্যায়, তাহা ধ্বংস হইবেই, আর যাহা সুন্দর তাহা স্থায়ী হইবেই। আপনি যে মহা প্রাসাদের ভিত্তি প্রোথিত করিয়া গেলেন আপনার অবিদ্যমানে অন্য সবল হস্ত তাহাকে আকাশস্পর্শী করিয়া তুলিবে।

আকবর। ঈশ্বর করুন তাহাই হোক, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেলিমের সম্বন্ধে এত বড় আশা পোষণ করিবার ত কিছুই দেখিতেছি না। সংসারে সে একটীমাত্র জিনিষকে ভালবাসে—তাহা আমোদ।

যোধাবাই বলিলেন, "সে এখনও নিতান্ত ছেলে মানুষ, তাহার হৃদয় অতি উচ্চ। বিবাহে তাহার সকল উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইতে পারে, তাহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে।" আকবর তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "প্রেমের শক্তি অসীম, প্রেমে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। কল্যাণময়ী ভাগ্যদেবতার ন্যায় মিহর-উল-নিশা তাহাকে রক্ষা করিতে পারে এবং তাহাকে রক্ষা করিয়া এই বিশাল রাজ্যকেও উৎপীড়ন ও কুশাসনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে।"

যোধাবাই। কিন্তু সেলিমের সঙ্গে মিহরের যাহাতে বিবাহ হয়, আপনাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে! সেলিম ত আর তাহার পিতার মত নয়, যে নিজেই নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইবে! আমরা সাহায্য না করিলে সে এ পথের অন্তরায়গুলি দূর করিতে পারিবে না।

আকবর। আমি ত কোন অন্তরায়ই দেখি না। মিহর-উল-নিশা কি আর কাহাকেও ভালবাসে? তাহা হইলে ত আমাদের আর কিছুই করিবার নাই। কিন্তু

৭৪৭

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সে সেলিকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। সেলিমও তাহারই মত সুন্দর, উভয়েই উভয়ের যোগ্য।

যোধাবাই। সে ত সেলিমের আরাধনা করে! নিজের মায়ের সম্মুখে সে সেলিমের প্রতি তাহার ভালবাসার কথা আমাকে বলিয়াছে! আর কোন মেয়ে কি এতটা সাহস দেখাইতে পারিত? বাহিরে তাহাকে যেমন গোবেচারী বলিয়া বোধ হয় বস্তুতঃ সে তাহা নয়, সে তেজস্বিনী, জলন্ত প্রেমময়ী মেয়ে। আজ আমার ঘরের পাশেই সে সেলিমের সহিত প্রেমালাপ করিয়া লইয়াছে! আমাদের ন্যায় নিশ্চয়ই ইহারাও গোপনে ইতিপূর্ব্বে বহু বার দেখা সাক্ষাৎ করিয়া থাকিবে।

আকবর। তবে আর ইহাদের বিবাহের পক্ষে বাধা কি? নিশ্চয়ই গীয়াসবেগের আপত্তির কারণ নাই!

যোধাবাই। তাহার আপত্তি আছে। মিহরের মা আমাকে বলিতেছিলেন, গীয়াসবেগ আলিকুলিবেগের সহিত মিহরের বিবাহ সুস্থির করিয়াছেন।

আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি আমাকে কি করিতে বল? আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, সেলিম প্রস্তাব করিলে তাহারা আনন্দের সহিত সম্মতি দিবে।

যোধাবাই উত্তর করিলেন, "সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, আর সন্দেহ আছে বলিয়াই আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।"

দৃঢ় কণ্ঠে আকবর বলিলেন, "না প্রিয়ে, আমি তাহাদিগকে সম্মতি দিতে বাধ্য করিতে পারি না, আমি তাহাদিগকে অনুরোধ পর্য্যন্ত করিতে পারিব না। কারণ, আমার অনুরোধ তাহাদের নিকট আদেশের ন্যায়ই বোধ হইবে; আমি কাহাকেও কোন বিষয়ে কোন আদেশ করিতে প্রস্তুত নই। আমি আইন-প্রণেতা, আমার পুত্রের সুখের জন্যও আমি আইন লঙ্ঘন করিতে পারি না। আমি বরং দুঃখ ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সকলের প্রতি সমভাবে ব্যবহার করিবার জন্য যে আইন প্রণীত হইয়াছে তাহার ব্যতিক্রমের জন্য আমার প্রভুত্ব প্রয়োগ আমি কিছুতেই করিতে পারিব না। যতই দুঃখের বিষয় হউক না, পুত্রবাৎসল্যের অধীন হইয়া আলিকুলিবেগ বা মীর্জা গীয়াসবেগকে স্থিরীকৃত সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে আমি অনুরোধ করিব না। এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী আমার অপত্য-স্থানীয়, সেলিমের সুখ শান্তির ন্যায় ইহাদের সকলেরই সুখ শান্তি আমার প্রার্থনীয়। একটীও অন্যায় বা নিষ্ঠুরতাপূর্ণ কার্য্য দ্বারা আমি আমার শাসনকার্য্য কলঙ্কিত করিতে চাই না। আমি সময় সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন জাতির প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করি; আমি দেখিতে পাই, পশ্চাদ্বর্ত্তীরা অগ্রগামী মহাপুরুষদিগের কার্য্যকে পর্য্যন্ত নিতান্ত অন্যায় রূপে সমালোচনা করে। সামান্য সামান্য ভুল ক্রটীকে অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়া গ্রহণ করে। অনেক সময় সাধুহৃদয় পুরুষদিগকেও আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সদুদ্দেশ্যে, অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়; কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা না করিয়া লোকে তাহাদের শুধু দোষই দেখিতে পায়। রাজ্যের কল্যাণের জন্য সময় সময় আমাকেও আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে অত্যন্ত অপ্রীতিকর কোন কোন কায করিতে হয়; কিন্তু মানুষের মধ্যে যেন কি একটা দুষ্ট প্রবৃত্তি রহিয়াছে, সরল ভাবে, সদুদ্দেশ্যে যাহা করা যায় তাহারও একটা কু অর্থ করে; অপরের অকৃতকার্য্যতায় আনন্দ অনুভব করা যেন মানুষের একটা স্বভাব! এক জনের জীবনে অনেক সদ্‌গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষগুলির আলোচনা করিতেই মানুষ যেন বেশী সুখ পায়। সংসারিক লোকের নিকট কোন নিঃস্বার্থ মানুষের অস্তিত্বই যেন অপ্রীতিকর! কোন দেবতুল্য লোকও প্রলোভনের অতীত নয়, ইহা দেখিলে যেন মানুষ সুখ পায়! সংসারে যাঁহারা লোকের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে চাহেন, বিশেষ বিবেচনার সহিত তাঁহাদিগের প্রত্যেক কায করা উচিত। আমার প্রজারা আমাকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যাহাতে অক্ষত থাকে আমার পক্ষেও সেইরূপ ব্যবহারই কর্ত্তব্য।

যোধাবাই। আপনি যাহা বলিলেন সবই সত্য। কিন্তু আমি ত বর্ত্তমান বিষয়ে আপনার মত এত ধীর ও

শান্তভাবে চলিতে পারি না! আমি দেখিতেছি, আমার পুত্রের সুখশান্তি বিপদগ্রস্ত, আর বুঝিতেছি যে আপনার একটী আদেশে, আপনার একটী কথায় তাহার সুখশান্তি চির দিনের জন্য অব্যাহত থাকে।

আকবর। কিন্তু আমি এরূপ কোন আদেশই করিব না। সেলিম নিজে তাহাদিগকে সম্মত করিতে চেষ্টা করুক, যদি তাহারা তাহার কথা না শুনে, আমি কিছুই করিব না।

যোধাবাই। আপনি যদি বুঝিতে দেন, যে আপনি এ প্রস্তাব সমর্থন করেন, তবে হয়ত তাহার চেষ্টা সফল হইতে পারে, নতুবা আমি ত আর তাহার সাফল্যের কোন আশা দেখি না?

আকবর। আচ্ছা, এত টুকু করিতে আমি রাজি আছি। প্রকাশ্যে আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারি, কিন্তু তার বেশী আর কিছু আমাদ্বারা হইবে না।

যোধাবাই। আর একটু না করিলে চলিবে কেন? সেলিম যদি মিহর-উল-নিশাকে বিবাহ করিতে না পায় তবে ইহার ফলাফল কি হইবে কে জানে?

আকবর শান্তভাবে উত্তর করিলেন, "সে বিষয়ে আমার কোন ভয় নাই। সেলিম নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি যুবক, তার ভালবাসা একটা সখ মাত্র, দুদিন পরে আর তা থাকিবে না, সে জন্য তুমি ভাবিও না। সে যে নীচ লোকদিগের সঙ্গে মিশে সেই জন্যই আমার মনোকষ্ট। তাহার চরিত্রের উপর একটা প্রকাণ্ড জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, কোথায় সেই ভার গ্রহণের জন্য সে প্রস্তুত হইবে, না বৃথা আমোদে সে এই মূল্যবান সময় নষ্ট করিতেছে! যাহোক, কঠোর শাসন ও প্রেমে এই বিপথগামী সন্তানকে সংশোধন করিতে হইবে।"

মাতৃস্নেহ বিগলিত হৃদয়ে যোধাবাই বলিলেন, "আর কোন উপায় অবলম্বনের পূর্ব্বে কোমল ব্যবহারই অবলম্বন করুন। তাহার প্রকৃতি অতি কোমল, নিশ্চয়ই কোমল ব্যবহারে তাহার চরিত্র সংশোধিত হইবে, কঠোর ব্যবহারে তাহার বরং অনিষ্ট হইবারই আশঙ্কা। আপনিই ত বলিলেন, নিন্দা করা মানুষের স্বভাব, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তাহার সম্বন্ধে যত নিন্দা শোনা যায় সমস্ত কখনই সত্য নহে।"

আকবর। তা হইতে পারে, কিন্তু অসম্ভব গল্পের মূলেও একটু না একটু সত্য থাকে, সকল নিন্দার মূলেই হয়তঃ একটু না একটু কারণ থাকে।

যোধাবাই। কিন্তু মিহর-উল-নিশার প্রতি তাহার যে আকর্ষণ তাহা সত্যই প্রকৃত প্রেম হইতে পারে, তাহা একটা খেয়াল না-ও হইতে পারে। ইহাতে তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; প্রকৃত প্রেমের শক্তি অসীম।

আকবর। আমার ত বোধ হয়, একনিষ্ঠ প্রকৃত ভালবাসা সেলিমের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। বুলবুলের মত যখন যে ফুল দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই দিকেই সে যায়। মিহর-উল-নিশা যে তাহাকে চিরবন্দী করিয়া রাখিতে পারিবে সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে।

যোধাবাই। আপনি বোধ হয় ভুল বুঝিলেন। কোন নারীর পক্ষে যাহা সম্ভব নয় মিহর-উল-নিশার পক্ষে তাহা সম্ভব! আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, মিহর-উল-নিশা তাহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন করিতে পারিবে।

শ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া আকবর বলিলেন, "তা হইতে পারে, কিন্তু এখন এ সকল কথা রাখিয়া দাও। এই বিষয় এখন ভাবিতে গেলে সারা রাত্রি আমার ঘুম হইবে না। আমি মনটা একটু হালকা করিবার জন্য তোমার কাছে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানেও চিত্তবিক্ষেপকারী বিষয় আসিয়া উপস্থিত! বাস্তবিক, রাজা রাজড়ার ভাগ্যে বিশ্রাম নাই!"

যোধাবাই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, "আহা! আমি কি নির্ব্বোধ! আপনি এত ক্লান্ত, আর আমি এ সময় আপনাকে এ সকল কথা লইয়া বিরক্ত করিতেছি!" তিনি তৎক্ষণাৎ আকবরের জন্য সুপেয় সরবৎ প্রস্তুত করিলেন, পরম তৃপ্তির সহিত আকবর তাহা পান করিলেন। তৎপর যোধাবাই একটী সেতার লইয়া বাজাইতে লাগিলেন, সুকোমল অঙ্গুলি সঞ্চালনে তাহা হইতে মধুর স্বরলহরী উত্থিত হইতে লাগিল, তিনি সেতারের

সুরের সঙ্গে আপনার অমৃতনিস্যন্দিনী সুর মিলাইয়া মধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন।

তানলয় মিশ্রিত সেই মোহন সঙ্গীত আকবরের কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল, ধীরে ধীরে তিনি শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

মঞ্জিরা।*

(১)

জয়ন্তী পাহাড় আকাশে মিশেছে লতাপাতা গাছে ঢাকা,
তারি মাঝে থাকে ঝরণার ধারে পাহাড়ে' বালিকা একা।
নাই পিতা মাতা, কেহ নাহি জানে কোথায় তাহার ধাম,
দেখিলে পথিকে ছুটিয়ে পালায় মঞ্জিরা—তাহার নাম॥

ক্ষুদ্র বালিকা ছুটোছুটি খেলে বন্য মৃগীর সাথে,
বনের বিহগে ডাকিয়ে ফিরায় আদরে বসায় হাতে।
পাখীর পালক কেশেতে বসান' গাছের বাকল পরা,
ফল পে'ড়ে খায় হাসে গায় নাচে অনন্ত আনন্দ-ভরা॥

যখন আকাশে উঠে আসে মেঘ, বায়ু বহে সন্ সন্,
ঝক্ ঝক্ ঝক্ ছুটিয়ে বিজলী ঝলসয়ে তরু বন,
তখনি বালিকা বিজন কাননে স্বাধীন উল্লাসে গায়,
বন্ধন-বিহীন উচ্ছসিত হাসি গগনে উধাও ধায়॥

(২)

আসিল একদা ব্যাধের বালক পথ ভুলে' এই দেশ
হাতে ধনুর্ব্বাণ বকল পরা, মাথায় কুঞ্চিত কেশ,
সোণার কান্তি, সুন্দর মুখ, স্নিগ্ধ নয়নে চায়,
স্তব্ধ কল ধ্বনি মুগ্ধ নয়না মঞ্জিরা দেখিল তায়।

পাখীর পালক দুলিছে শিরেতে অপূর্ব্ব কিরীট ঘটা,
হেলিয়ে দাঁড়ায় বঙ্কিম ঠামে কত না রূপের ছটা।
মাতায়ে কানন মধুর নিক্কণে ফুকারি বাজায় বাঁশী,
শুভ্র নিরমল দশনকান্তি কথা কয় মৃদু হাসি॥

চিত্রপুতুলী বালিকা দেখিল—নেত্রপলক হীন—
"বড়ই সুন্দর,—এমন কিছুতো হেরিনিকো এতদিন।"
মঞ্জিরার প্রাণ—কাননের পাখী—সরল আবেগে ধায়,
"বড়ই সুন্দর",—মুগ্ধ পরাণ বিকাল' তাহার পায়॥

(৩)

বৎসর দশ কেটে গেল সুখে চখের নিমিষ যেতে,
গাছের তলায় পাতার কুটীরে সোণার সংসার পেতে,
আদরে স্বামীরে মঞ্জিরা গৃহিণী "ফুলজান" বলে' ডাকে,
ধনুকে, পালকে, সোহাগে সাজায় বড় ভালবাসে তাকে॥

ছোট ছুটী শিশু,—একটী বালক একটী বালিকা আর।
আদর-সোহাগ-বিরাজিত গেহ সুখের নাহিক পার!
বালক বালিকা ছুটিয়ে বেড়ায়,—করতালি দিয়ে হাসে,
ফুলজান এসে হেসে বসে কাছে,—মঞ্জিরারে ভালবাসে!

"কাননের পাখী নিরীহ নির্দ্দোষ,—উহারে মেরো না আর,
মৃগের শাবকে ভালবাসি আমি,—নিয়োনা পরাণ তার"—
মঞ্জিরার কথা, ফুলজান শুনে ছেড়ে' দিল পাখীমারা,
মৃগ হানিত না, মারিত না কিছু বরাহ শার্দ্দুল ছাড়া॥

(৪)

জয়ন্তী পাহাড়ে ধৌত করি ধায় খরস্রোতা কল কল
জয়ন্তী নদীটী;—তারি ধারে এল ক্ষুদ্র ব্যাধের দল।
ফেলিল ছাউনি, করিতে মৃগয়া পাহাড়ের ঘন বনে।
মঞ্জিরা অভাগী,—ফুলজান গিয়ে মিশিল তা'দের সনে!

ব্যাধের তনয় ব্যাধের সাথে মিশি চ'লে গেল কোথা!
বুঝি বা সে দলে আগেকার জানা আর কেহ ছিল সেথা!
মঞ্জিরা অভাগী, কোথা ভেসে গেল—ফুলজান ফেলে তায়,
পালক পুচ্ছে রচিত কিরীট হেলাইয়ে চ'লে যায়!

হিয়ার বঁধুয়া ফুলজানে ডেকে অভাগী কাঁদিল কত!
"বাবা' বলে কেঁদে শিশুরা নয়ন মুদিল জনম মত!
সব সারা হল। প্রাণভেঙ্গে যায়! মঞ্জিরা কুটীর দ্বারে
একা বসে থাকে, ফুলজান বুঝি আসিতেছে এই বারে।

---

* ১৯০৩ সালে ভুটান দুয়ারের অন্তর্গত বাক্সা ও জয়ন্তী পর্ব্বত এবং তৎসংলগ্ন হাতীপোতা জঙ্গলে রাজকার্য্যোপলক্ষে যাইতে হইয়াছিল। জয়ন্তী কুচবিহার ষ্টেট রেলওয়ের "টারমিনস্" বা সীমান্ত ষ্টেসন, পাহাড়ের নীচেই জয়ন্তী নদী। পার্ব্বত্য প্রদেশে শ্রুত প্রবাদ মূলের উপর এই কবিতার বিষয়ীভূত গল্প নিহিত। লেখক।

(৫)

জয়ন্তী নদীর শিলার উপর জয়ন্তী পাহাড় বনে
কেগো ওই কাঁদে, কখনো বা হাসে গান গায় নিজ মনে,
কভু বা পালায় ব্যাধ-ভয়ে ভীত হরিণ শাবক মত,
কভু ডাকে ওই আর্ত্ত হাহুতাশে "ফুলজান" বলে কত !

নিঝুম নিশীথে কেগো যেন কাঁদে মৃতশিশু কোলে নিয়ে,
কাহার ক্রন্দনে নির্দ্দয়ে উত্তর প্রতিধ্বনি যায় দিয়ে।
সুদূর পর্ব্বত,—তারা কিগো জানে কোন দেশে ফুলজান ?
মজিয়া অভাগী, আজো ওই কাঁদে শূন্য উদাস প্রাণ।

আজিও যখন মেঘ উঠে আসে বায়ু বহে সন্ সন্,
ঝক্ ঝক্ ঝক্ ছুটিয়ে বিজলী ঝলসয়ে তরু বন,
তখনি অভাগী কাঁপায়ে কানন রুদ্ধকণ্ঠে গীত গায়,
বন্ধন-ছিন্ন উন্মত্ত-উচ্ছ্বাস গগনে উধাও ধায় !

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

বৈদিক সমাজ-চিত্র।

(প্রথম খণ্ড, একাদশ সংখ্যার পর)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ের বর্ণিত ঘটনাবলীর পর সাত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সেই সময়ের বালকেরা যুবক ও বালিকারা যুবতী হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের বেদ-বিদ্যালয় হইতে অনেক যুবক সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া রাজা, মন্ত্রী, বিচারক, বণিক ও ব্যবসায়ী হইয়াছে। মৈত্রেয় বেদাধ্যাপনা কার্য্যে পিতার সহায়তা করিতেছেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার হাত হইতে সম্পূর্ণ কার্য্যভার লইতে প্রস্তুত হইতেছেন। আমাদের ব্রহ্মগুপ্ত জনকপুরে বেদাধ্যয়ন ও অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পিতার কার্য্যভার গ্রহন করিয়াছেন। কিন্তু যে নগরে তাঁহার জীবনের একটী উৎকৃষ্ট অংশ অতিবাহিত হইয়াছে, যেখানে অনেক প্রিয় বন্ধুকে ফেলিয়া গিয়াছেন, সেখানে মধ্যে মধ্যে না আসিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ সেনাপতি যজ্ঞদত্তের পরিবারবর্গের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ অতি গাঢ়। তাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বদাই অতীব সাদর নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা করেন।

এই সময়ে সেনাপতি তদীয় প্রিয়তমা কন্যা গঙ্গার স্বয়ম্বরের আয়োজন করিতেছেন। গঙ্গার বয়স বিশ বৎসর। রূপ লাবণ্য, বিদ্যাবত্তা, স্বভাবের পবিত্রতা ও মধুরতা, এই সকল গুণে তিনি সমগ্র বিদেহ-দেশ ও ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। জনকপুরে বিদ্বান ও শৌর্য্যবীর্য্যশালী অনেক যুবকের সহিতই তাঁহার পরিচয় আছে; তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি ইঁহাদের মধ্যে যে কোন যুবককে বিবাহ করিতে পারেন। অনেক রাজাও রাজকুমার তাঁহার পাণি-গ্রহণার্থী হইয়াছেন; অন্য উপযুক্ত লোকের ত কথাই নাই। কোন বিশেষ যুবকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ থাকাও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু সাধারণ প্রচলিত প্রণালীতে পাত্রস্থা হওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে, তাঁহার পিতারও ইচ্ছা নহে। উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের চির অবলম্বিত প্রণালী যাহা, কন্যার বিবাহে বীরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞদত্তের সেই প্রণালীই অববম্বন করিবার ইচ্ছা, আর বীরসুতা গঙ্গারও তাহাতেই অভিমত। কোন কঠিন লক্ষ্যভেদ, সেই লক্ষ্যভেদে বিবাহার্থীর অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা ও সেই সর্ব্ববিজয়ী লক্ষ্যভেত্তাকে কন্যার প্রকাশ্য বরণ, এই চির-পূজিত স্বয়ম্বর প্রণালীই পিতা পুত্রী উভয়ের অভিমত। আত্মীয় স্বগণ সকলেরই হৃদয়ে ক্ষত্রিয় ভাব প্রবল, প্রাচীন বীর-কাহিনী সকলেরই শ্রদ্ধা ও গৌরবের বস্তু, সুতরাং এই স্বয়ম্বর প্রস্তাবে সকলেরই আন্তরিক সম্মতি। কাজেই বহু আড়ম্বরের সহিত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতে লাগিল।

মহারাজ জনকের বৃহৎ সেনানীর অধিনায়ক যজ্ঞদত্তের যশ যেমন বহুবিস্তৃত, তদীয় পদ ও সম্মান যেমন উচ্চ, তদীয় কন্যার স্বয়ম্বরে যাহাতে তদনুরূপ সমাদর, অভ্যর্থনা ও আনন্দ-সম্ভার হয় তাহার সমুচিত উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। ভারতের সমুদায় রাজন্যবর্গ স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রিত হইলেন। শূদ্র বা অনার্য্য রাজন্যগণ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন না। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক অধ্যাপক, রাজমন্ত্রী, সেনাপতি ও সম্মানিত

বণিক আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইলেন। আর সাধারণের অবগতির জন্য সমগ্র বিদেহরাজ্যে ঢকারবের সহিত এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল, যে প্রস্তাবিত লক্ষ্যভেদে যিনি সমর্থ হইবেন, জাতি ও পদনির্ব্বিশেষে তাঁহাকেই দেবী গঙ্গা পাণি দান করিবেন। এই জাতিভেদ-নিপীড়িত যুগে বুঝিয়া উঠা কঠিন, তখনকার উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আপন পদসম্মান বিস্মৃত হইয়া কিরূপে যে কোন লক্ষ্যভেত্তাকে নিজ কন্যা দান করিতেন। ইহা সত্য, যে সেই প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা উদার, স্বাধীনচেতা ও উন্নতিশীল জাতি ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন স্বয়ম্বর-প্রথাতে কিছু গভীর যুক্তিযুক্ততাও ছিল। আপাততঃ অন্যরূপ বোধ হইলেও বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় কন্যা ইহাতে ক্ষত্রিয় হস্তগতই হইতেন। প্রস্তাবিত লক্ষ্যভেদ প্রায়ই অতি কঠিন ব্যাপার হইত। সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ অস্ত্রধারী ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সেই কার্য্য সাধন সম্ভবপর হইত না। আর এরূপ দুরূহ কার্য্যসাধনে যিনি সমর্থ হইতেন তিনি দৃশ্যতঃ নিম্নশ্রেণীস্থ হইলেও গুণ-কর্ম্ম প্রভাবে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইতেন। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয়-কন্যা বস্তুতঃ আপন উচ্চপদ হইতে বিচ্যুতা হইতেন না। প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের ভাব এইরূপ ছিল। সম্ভবতঃ সেনাপতি যজ্ঞদত্তেরও এই ভাবই ছিল। তিনি একদিকে যেমন বীর্য্যবান্ ও রণকুশল ছিলেন অন্যদিকে তেমনি বিদ্বান্ ও চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁহার পক্ষে এরূপ উচ্চভাবই স্বাভাবিক।

জনকপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে যজ্ঞদত্তের এক উদ্যান-বাটিকা ছিল, সেই উদ্যান-বাটিকাতে স্বয়ম্বরের আয়োজন হইয়াছে। দর্শকগণের বসিবার জন্য স্বয়ম্বরস্থলের চতুর্দ্দিকে সুচিত্রিত মনোহর চন্দ্রাতপের নিম্নে বৃত্তাকারে বহুসংখ্যক মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। মধ্যস্থানে শূন্য ভূমিতে উচ্চ একটী স্তম্ভের শীর্ষভাগে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী ময়ূর দ্রুতগতিতে ঘূর্ণায়মান হইতেছে,—ইহাই লক্ষ্য। প্রবেশ-দ্বারচতুষ্টয়ে সশস্ত্র প্রহরীগণ দণ্ডায়মান। স্বয়ম্বর স্থলের অনতি দূরে নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত অতিথিগণের জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। উদ্যান-বাটিকা একটী শিবিরময় বিশাল নগর অথবা শত্রু-নগর-বেষ্টনকারিণী একটী বৃহতী সেনার শিবিরের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

স্বয়ম্বর দিবসের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণে জনকপুরবাসীগণও সেই উদ্যান-বাটিকায় উপস্থিত হইলেন। যুবকগণেরই উৎসাহ ও ব্যস্ততা অধিক, তাঁহাদের অনেকেই লক্ষ্যভেদ করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু লক্ষ্যভেদ ব্যতীত সেখানে তাঁহাদের আরো আকর্ষণের কারণ ছিল। সেই উদ্যান-বাটিকার চতুষ্পার্শ্বে বনে জঙ্গলে শিকারোপযোগী অনেক বন্য পশুপক্ষীর আবাস। নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে অনেক আদিম অধিবাসীও বাস করিত। এই আদিম অধিবাসীগণ পূর্ব্বে আর্য্য বিজেতাগণের উপর নানাপ্রকারে উপদ্রব করিত, তাঁহাদের যজ্ঞ নষ্ট করিত, তাঁহাদিগকে বধ করিত এবং সুবিধা পাইলে ধরিয়াও লইয়া যাইত। পূর্ব্বে দেখিতে পাইলেই আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে বধ করিতেন। এক সময়ে এই অনার্য্য-শিকার আর্য্য যুবকগণের বিশেষ প্রলোভনের বিষয় ছিল। বর্ণিত ঘটনার সময়েও কোন কোন আর্য্য উপনিবেশ অসভ্য অনার্য্যদিগের দ্বারা উপদ্রুত হইত। কিন্তু বৃহৎ নগরোপকণ্ঠে অবস্থিত বলিয়া এবং প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ জনকের ভয়ে এই স্থানের অনার্য্যদিগের অন্তর হইতে আর্য্য-রক্ত-লালসা ও আর্য্য-ধন-হরণস্পৃহা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের শান্তিশীলতা দর্শনে মহারাজ জনকও ইহাদিগের প্রতি কোনরূপ উৎপাত করিতেন না। তাঁহার রাজ্যের নানা স্থানে পাহাড়ে পর্ব্বতে এই সকল আদিম অধিবাসী স্বচ্ছন্দে পশুপক্ষী শিকার করিয়া ও মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এই কারণে সমবেত আর্য্য যুবকগণের অন্তরে নিকটবর্ত্তী অনার্য্যগণের প্রতি কোন প্রকার উপদ্রব করিবার অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিপরীত ঘটিল।

স্বয়ম্বরের পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণে জনকপুর হইতে সমাগত লোকেরা স্বয়ম্বরের আয়োজন ও চারিদিকের

নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। এক দল ধনুর্দ্ধারী যুবক একটী পর্ব্বতের পার্শ্বে পক্ষী-শিকারে নিযুক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গঙ্গার পাণিপ্রার্থী। বোধ হয় যেন তাহারা পর দিনের কঠিন কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মৈত্রেয় গঙ্গার পাণি-প্রার্থী না হইলেও এই যুবক-দলের মধ্যে ছিলেন। তিনিও ধনুধারী কিন্তু দুই একটী পাখী শিকার করিয়া অল্পকাল পরেই তিনি শিকার পরিত্যাগ করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনিও স্বয়ম্বরের কথাই ভাবিতে ছিলেন, কিন্তু তাহা গঙ্গাদেবীর স্বয়ম্বর নহে। এই স্বয়ম্বর আর এক স্বয়ম্বর-ভাবনার উদ্রেক করিয়াছিল। বিষ্ণুমিত্র-দুহিতা বহুগুণ-সমলঙ্কৃতা সরস্বতী দেবীর স্বয়ম্বর অচিরেই সম্ভব। সেই কথা স্মরণ করিতেও মৈত্রেয়ের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছিল, তাঁহার রক্তিম গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল। তিনি জানিতেন, সেই তরুণীর পাণিলাভ তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ ধনুর্ব্বিদ্যায় তিনি সুদক্ষ হইলেও তিনি কিছুতেই ধনুর্ব্বেদাচার্য্যের সুশিক্ষিত শিষ্যমণ্ডলীর সমকক্ষ ছিলেন না। তদ্ব্যতীত জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের জন্যই স্বয়ম্বরে প্রতিযোগিতার পথ উন্মুক্ত থাকিলেও এক জন বেদাচার্য্যের পক্ষে ব্যবসায়ী ধনুর্দ্ধারীগণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়-কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তেমন লোকপ্রিয় ব্যাপার ছিল না। ক্ষত্রিয়-দুহিতা—বিশেষতঃ প্রিয়বন্ধু বিষ্ণুমিত্রের কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে তাঁহার পিতার কোন আপত্তির কারণ ছিল না, কিন্তু স্বয়ম্বর-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে তিনি যে মৈত্রেয়কে অনুমতি দিবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। ভাবিতে ভাবিতে মৈত্রেয়ের চিত্ত নিতান্তই বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল, বহু বৎসর ধরিয়া নীরবে হৃদয়-মন্দিরে তিনি যে দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন তাঁহাকে সেই উচ্চাসন হইতে বিসর্জ্জন করা ব্যতীত আর গত্যন্তর দৃষ্ট হইতেছিল না। তিনি এই প্রকার চিন্তাকুল হৃদয়ে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের আকর্ষণ প্রভাবেই তাঁহার আরাধ্যা দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। সরস্বতী কতিপয় সমবয়স্কা যুবতীর সঙ্গে চারিদিগের নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি মৈত্রেয়কে দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু সহসা অনতিদূরস্থিত একটী মনোহর বন্যপুষ্পাচ্ছাদিত কুঞ্জ দেখিয়া পুষ্পচয়নের প্রলোভনে তিনি সঙ্গিনীদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া গেলেন এবং ক্রমে তিনি একটী ক্ষুদ্র শৈলের পশ্চাতে যাওয়াতে তাহাদের অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। মৈত্রেয় ও তাঁহার সঙ্গীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সরস্বতীর অনেকটা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। হঠাৎ সরস্বতীর আর্ত্ত স্বরে তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং দেখিতে পাইলেন এক ভীষণদর্শন অনার্য্য বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতের দিকে ছুটিয়াছে। চীৎকার করিতে করিতে সবেগে তিনি সেই দুর্বৃত্তের পশ্চাতে ছুটিলেন, কিন্তু তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর সরস্বতীকে বিদ্ধ করিতে পারে, এই ভয়ে তীর নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। তিনি দৌড়িয়া তাহাকে ধরিবেন এই উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। এমন সময় সরস্বতীর পলায়ন-চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য সেই দানবতুল্য অনার্য্য তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্তপদ ধরিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। মৈত্রেয় তখন সুবিধা পাইয়া সেই দানবের নিম্নাঙ্গ লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন। ফলভারাক্রান্ত বিশাল তালবৃক্ষের ন্যায় সেই দস্যু সরস্বতীসহ ভূপতিত হইল। সরস্বতী সেই দস্যুর হস্ত হইতে সবলে মুক্তি লাভ করিয়া আপন উদ্ধারকর্ত্তার দিকে দৌড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া বাণাহত কপোতীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। সরস্বতীও মৈত্রেয়ের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, তিনিও গোপনে তাঁহাকেই হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বররূপে আরাধনা করিতেন, তাঁহার বক্ষের অমৃতায়মান স্পর্শে অতি শীঘ্রই সরস্বতী প্রকৃতিস্থ হইলেন।

ইতিমধ্যে সরস্বতীর আর্ত্তনাদ ও মৈত্রেয়ের চীৎকার শ্রবণে মৈত্রেয়ের শিকারনিরত সঙ্গীগণ আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। সরস্বতীর সঙ্গিনীগণের চীৎকার শুনিয়া শিবির হইতেও বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। মৈত্রেয়ের নিকট হইতে কোন কথা শুনিবার পূর্ব্বেই আহত ও ভূপতিত দস্যুকে দেখিয়া সকলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্রই এক দল যুবক তাহার নিকট ছুটিয়া গেল, এবং সকলের অগ্রগামী যুবক তাহার তরবারির আঘাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু এই এক জনকে বধ করিয়াই সেই ক্রোধোন্মত্ত যুবকদল ক্ষান্ত হইল না। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের শিখর-দেশে বহুসংখ্যক অনার্য্য দস্যু দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া এবং তাহাদেরও অভিসন্ধি ভাল নহে বুঝিতে পারিয়া ক্ষত্রিয় যুবকদল তাহাদের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল, মুহূর্ত্তমধ্যে প্রায় সকল দস্যুই ভূপতিত হইল। দুই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের ক্রোধের নিবৃত্তি হইল না। কিঞ্চিৎ দূরে পাহাড়ের উপর অনার্য্য-দিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর দেখা যাইতেছিল, সেই সকল কুটীর আক্রমণ করিয়া অনার্য্যদিগকে বধ করিবার জন্য যুবকদল ধাবিত হইল। কিন্তু তাঁহারা অধিক দূর অগ্রসর না হইতেই পশ্চাতে "থাম, থাম" শব্দ শুনিয়া নিরস্ত হইল। চাহিয়া দেখিল, সেনাপতি স্বয়ং এক দল সৈন্যসহ উপস্থিত। তিনি বলিলেন, "বৎসগণ আমার অনুরোধ, তোমরা নিরস্ত হও। আমরা ক্ষত্রিয় জাতি, প্রয়োজন হইলে আমরা রক্তপাতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইব না। কিন্তু ঐ দূরবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ কিছুমাত্র অপরাধ করে নাই। এই হতভাগ্য তাহার জীবন দিয়া যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল হয়তঃ তাহা কেবল ইহার নিজেরই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল, যাহারা ইহার সহিত সহানুভূতি করিতেছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল তোমরা তাহাদিগকেও বধ করিয়াছ। আনন্দোৎসবের পূর্ব্বক্ষণে আর রক্তপাতে প্রয়োজন নাই। আমি এই স্থানে এক দল প্রহরী রাখিয়া যাইতেছি, সারা রাত্রি এবং আগামী কল্য দিবাভাগে ইহারা এখানে পাহারা দিবে, আর দেখিবে যাহাতে কোন অনিষ্টকারী স্বয়ম্বর ভূমির নিকটে না আসিতে পারে। যাহা ঘটিয়াছে তজ্জন্য আমাদের বিশেষ দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। এক স্বয়ম্বরের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আর এক স্বয়ম্বর সংঘটিত হইল, ইহা বরং একটী শুভ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সহাস্য বদনে প্রথমে মৈত্রেয় এবং তৎপরে তাঁহার সঙ্গী যুবকদিগের প্রতি তাকাইলেন। তাহারাও মৈত্রেয় ও পরস্পরের প্রতি তাকাইয়া মৃদু হাস্য করিল। তাহারা বুঝিল, সেনাপতি বয়সে প্রাচীন হইলেও তাঁহার হৃদয় তাহাদের হৃদয়ের ন্যায়ই তরুণ। তাহারা সকলে অন্তরে অন্তরে যাহা অনুভব করিতেছিল, সেনাপতি প্রকাশ্যে তাহাই ব্যক্ত করিলেন মাত্র। সরস্বতীর প্রকৃত স্বয়ম্বর আজই হইয়া গেল, অতঃপর তাঁহার আর কোন স্বয়ম্বর আবশ্যক, ইহা কেহই ভাবিল না। যাহা হউক, এখন গঙ্গার স্বয়ম্বরের কথা বলিব।

সপ্তম অধ্যায়।

পর দিন প্রাতঃকালে শিঙ্গা, ঢাক প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যে শিবিরস্থ জনসঙ্ঘের নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বয়ম্বর দর্শনের আশায় প্রতি ক্ষত্রিয়-হৃদয় আনন্দে ও কৌতুহলে নৃত্য করিতে লাগিল। শিবিরে সেই রজনীতে অল্প লোকই নিদ্রা গিয়াছিল, পূর্ব্বদিন যাহারা আসে নাই রাত্রি প্রভাতের বহু পূর্ব্বেই জনকপুর হইতে তাহারা দলে দলে স্বয়ম্বর-স্থলাভিমুখে যাত্রা করিল। বেলা দুই দণ্ড অতীত না হইতেই সেই বিশাল মঞ্চপরম্পরা সম্পূর্ণরূপে লোকপূর্ণ হইয়া গেল। সেই শোভন মহান দৃশ্যে সকলেরই মনপ্রাণ যেন মুগ্ধ হইয়া গেল। মঞ্চবেষ্টিত শূন্য স্থানের এক পার্শ্বে এক খানি নবনির্ম্মিত সিংহাসন। বিদেহরাজ জনক তদুপরি সমাসীন, তাঁহার পার্শ্বে অমাত্যগণ উপবিষ্ট। রাজার সম্মুখে শূন্য স্থানের অপর প্রান্তে লক্ষ্যভেদেচ্ছুদিগের বসিবার স্থান। তাহাদের নিকটেই লক্ষ্য—এক উচ্চ স্তম্ভের শীর্ষভাগে স্থাপিত কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি ময়ূর যন্ত্র-বলে অতি দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে। এই ময়ূরের একটী চক্ষু যে ব্যক্তি শরবিদ্ধ করিতে পারিবে সেই ভাগ্যবান যুবকই গঙ্গার পাণিগ্রহণের অধিকারী বিবেচিত হইবে। মঞ্চশ্রেণীর অর্দ্ধাংশে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ ও অপরাপর সমাজপতিগণ উপবেশন করিয়াছেন, অপরার্দ্ধে

ভদ্রমহিলাগণ উপবিষ্টা। নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যস্থলে গঙ্গা শোভা পাইতেছেন। শত শত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহার প্রতি ধাবিত। রাজন্যবর্গ ও মহিলাগণের মণিমাণিক্যখচিত বেশভূষা এবং প্রথমোক্তগণের বর্ম্মচর্ম্মাদি অস্ত্রশস্ত্র নবোদিত সূর্য্য-কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সভাস্থলের অন্যান্য স্থান নানা দিগ্‌দেশাগত নানা শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোকে পরিপূর্ণ।

যথা সময়ে তুরীভেরী নিনাদে অনুষ্ঠানারম্ভের শুভ-মুহূর্ত্ত ঘোষিত হইল। সামরিক বাদ্য থামিয়া গেলে হোতৃ, উদ্‌গাতৃ ও অধ্বর্য্যু এই তিন শ্রেণীর ঋত্বিক ধীর গম্ভীর স্বরে যথাক্রমে ঋক্, সাম ও যজুর্মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। তৎপর মহারাজার আদেশে রাজদূত ঘোষণা করিল, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শুদ্র যে কোন ব্যক্তি ঘূর্ণ্যমান ময়ূরের এক চক্ষু শরবিদ্ধ করিতে পারিবেন, গঙ্গাদেবী তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন।" সভাস্থল নীরব হইল। এই কঠিন পণ পালন করা অতি নিপুণ ধনুর্দ্ধরের পক্ষেও যেন দুষ্কর বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক ক্ষণকাল পরে ধীর পাদক্ষেপে এক জন রাজা মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া লক্ষ্যের নিকটে আসিলেন। এক দৃষ্টিতে সকলে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পরিচয় ও শক্তি সামর্থ্য জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অনেকে পরস্পরের সহিত মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলনে। লক্ষ্য-ভেদার্থীর নাম ও পদ ঘোষিত হয় নাই, কেবল তাঁহার মস্তকস্থিত মুকুট দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিতেছিলেন যে ইনি এক জন রাজা। যে স্বয়ম্বরে প্রার্থীদিগকে শক্তির পরীক্ষা দিতে হইত তাহাতে তাঁহাদের পরিচয় ঘোষণা করিবার নিয়ম ছিল না, যে স্থলে কোন পণের ব্যবস্থা থাকিত না, কেবল সে স্থলেই নিমন্ত্রিতগণের পরিচয় দেওয়া হইত। বলাবাহুল্য যে এই রাজা লক্ষ্য-ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎপরে একে একে আরো উনিশ জন লক্ষ্যভেদার্থী কার্য্যে অগ্রসর হইলেন ও বিফল-প্রযত্ন হইলেন। তন্মধ্যে রাজা, রাজকুমার সেনানী, সাধারণ সৈনিক, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-জাতীয় ধনুর্ব্বেদ শিক্ষক, এমন কি শূদ্র রাজা ও যোদ্ধা সকল লোকই ছিলেন। তখন কিয়ৎকাল সভাস্থলে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তৎপর জনকপুরের ধনুর্ব্বেদাচার্য্য বিষ্ণুমিত্র গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি স্বয়ং প্রার্থী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার দশ জন শিষ্য প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহার পদতলে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধেই তিনি উঠিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই কঠোর কার্য্য সাধনে তাঁহাদিগকে উৎসাহ ও উপদেশ দেন। শিষ্যের জয়ে তাঁহার গৌরব, এই জন্য বিষ্ণুমিত্র তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল ও বাণনিক্ষেপের পূর্ব্বে তাঁহার উপদেশ শুনিতে লাগিল। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই ঃ—"পক্ষীটির উপর দৃষ্টি স্থির কর, অন্য সকল বস্তু তোমার দৃষ্টিপথ হইতে তিরোহিত হউক। পক্ষীর চক্ষু তোমার সম্মুখে আসিতে কতক্ষণ লাগে আর কতক্ষণে তোমার বাণ এ চক্ষু স্পর্শ করিবে, ভাবিয়া-স্থির কর। চক্ষু তোমার সমক্ষে আসিবার পূর্ব্বেই বাণনিক্ষেপ করিবে, যাহাতে চক্ষু তোমার সম্মুখীন হওয়া মাত্রই উহা তীরবিদ্ধ হয়। কোন্ মুহূর্ত্তে শর ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না, তাহা হইলে অন্য প্রার্থীদিগের উপর অন্যায় ব্যবহার করা হইবে।" এরূপ সূক্ষ্ম উপদেশ ও নির্দ্দেশ সত্ত্বেও এই শেষ প্রার্থীদলের নয় জন লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইলেন। এই নয় জনের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ, সাত জন ক্ষত্রিয় ও এক জন বৈশ্য ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ প্রায় কৃতকার্য্যই হইয়াছিলেন; তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত তীর ময়ূরের চক্ষু ঘর্ষণ করিয়া এক ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, একেবারে চক্ষুতে বিদ্ধ হয় নাই। অবশেষে দশম ও শেষ প্রার্থী দণ্ডায়মান হইলেন। ইনি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ব্রহ্মগুপ্ত; পাঠক-পাঠিকাকে না বলিলেও বুঝিতে পারিবেন, যে স্বয়ম্বর-সংবাদ শুনিয়া ব্রহ্মগুপ্ত বারাণসী হইতে জনকপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। বিদেহ-রাজধানীতে সকলেই তাঁহাকে জানিত, এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ নিপুণতার কথাও জনকপুর-বাসীগণের

ভদ্রমহিলাগণ উপবিষ্টা। নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যস্থলে গঙ্গা শোভা পাইতেছেন। শত শত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহার প্রতি ধাবিত। রাজন্যবর্গ ও মহিলাগণের মণিমাণিক্যখচিত বেশভূষা এবং প্রথমোক্তগণের বর্ম্মচর্ম্মাদি অস্ত্রশস্ত্র নবোদিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সভাস্থলের অন্যান্য স্থান নানা দিগ্‌দেশাগত নানা শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোকে পরিপূর্ণ।

যথা সময়ে তুরীভেরী নিনাদে অনুষ্ঠানারম্ভের শুভমুহূর্ত্ত ঘোষিত হইল। সামরিক বাদ্য থামিয়া গেলে হোতৃ, উদ্‌গাতৃ ও অধ্বর্য্যু এই তিন শ্রেণীর ঋত্বিক ধীর গম্ভীর স্বরে যথাক্রমে ঋক্‌, সাম ও যজুর্ম্মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। তৎপর মহারাজার আদেশে রাজদূত ঘোষণা করিল, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শুদ্র যে কোন ব্যক্তি ঘূর্ণ্যমান ময়ূরের এক চক্ষু শরবিদ্ধ করিতে পারিবেন, গঙ্গাদেবী তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন।" সভাস্থল নীরব হইল। এই কঠিন পণ পালন করা অতি নিপুণ ধনুর্দ্ধরের পক্ষেও যেন দুষ্কর বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক ক্ষণকাল পরে ধীর পাদক্ষেপে এক জন রাজা মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া লক্ষ্যের নিকটে আসিলেন। এক দৃষ্টিতে সকলে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পরিচয় ও শক্তি সামর্থ্য জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অনেকে পরস্পরের সহিত মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলনে। লক্ষ্যভেদার্থীর নাম ও পদ ঘোষিত হয় নাই, কেবল তাঁহার মস্তকস্থিত মুকুট দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিতেছিলেন যে ইনি এক জন রাজা। যে স্বয়ম্বরে প্রার্থীদিগকে শক্তির পরীক্ষা দিতে হইত তাহাতে তাঁহাদের পরিচয় ঘোষণা করিবার নিয়ম ছিল না, যে স্থলে কোন পণের ব্যবস্থা থাকিত না, কেবল সে স্থলেই নিমন্ত্রিতগণের পরিচয় দেওয়া হইত। বলাবাহুল্য যে এই রাজা লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎপরে একে একে আরো উনিশ জন লক্ষ্যভেদার্থী কার্য্যে অগ্রসর হইলেন ও বিফল-প্রযত্ন হইলেন। তন্মধ্যে রাজা, রাজকুমার সেনানী, সাধারণ সৈনিক, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-জাতীয় ধনুর্ব্বেদ শিক্ষক, এমন কি শূদ্র রাজা ও যোদ্ধা সকল লোকই ছিলেন। তখন কিয়ৎকাল সভাস্থলে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তৎপর জনকপুরের ধনুর্ব্বেদাচার্য্য বিষ্ণুমিত্র গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি স্বয়ং প্রার্থী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার দশ জন শিষ্য প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহার পদতলে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধেই তিনি উঠিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই কঠোর কার্য্য সাধনে তাঁহাদিগকে উৎসাহ ও উপদেশ দেন। শিষ্যের জয়ে তাঁহার গৌরব, এই জন্য বিষ্ণুমিত্র তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল ও বাণনিক্ষেপের পূর্ব্বে তাঁহার উপদেশ শুনিতে লাগিল। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই ঃ—"পক্ষীটির উপর দৃষ্টি স্থির কর, অন্য সকল বস্তু তোমার দৃষ্টিপথ হইতে তিরোহিত হউক। পক্ষীর চক্ষু তোমার সম্মুখে আসিতে কতক্ষণ লাগে আর কতক্ষণে তোমার বাণ এ চক্ষু স্পর্শ করিবে, ভাবিয়া-স্থির কর। চক্ষু তোমার সমক্ষে আসিবার পূর্ব্বেই বাণনিক্ষেপ করিবে, যাহাতে চক্ষু তোমার সম্মুখীন হওয়া মাত্রই উহা তীরবিদ্ধ হয়। কোন্‌ মুহূর্ত্তে শর ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না, তাহা হইলে অন্য প্রার্থীদিগের উপর অন্যায় ব্যবহার করা হইবে।" এরূপ সূক্ষ্ম উপদেশ ও নির্দ্দেশ সত্ত্বেও এই শেষ প্রার্থীদলের নয় জন লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইলেন। এই নয় জনের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ, সাত জন ক্ষত্রিয় ও এক জন বৈশ্য ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ প্রায় কৃতকার্য্যই হইয়াছিলেন; তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত তীর ময়ূরের চক্ষু ঘর্ষণ করিয়া এক ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, একেবারে চক্ষুতে বিদ্ধ হয় নাই। অবশেষে দশম ও শেষ প্রার্থী দণ্ডায়মান হইলেন। ইনি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত- ব্রহ্মগুপ্ত; পাঠক-পাঠিকাকে না বলিলেও বুঝিতে পারিবেন, যে স্বয়ম্বর-সংবাদ শুনিয়া ব্রহ্মগুপ্ত বারাণসী হইতে জনকপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। বিদেহ-রাজধানীতে সকলেই তাঁহাকে জানিত, এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ নিপুণতার কথাও জনকপুর-বাসীগণের



মালতী।

অবিদিত ছিল না। শিক্ষাকালে এই জনকপুরে কত কৃত্রিম যুদ্ধে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া কত পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তৎপর পিতার ব্যবসায় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তিনি এখন যে অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী তাহাও জনকপুরবাসীগণ জনেন। তাঁহার পরিচিত সকলের নিকটই তিনি গভীর শ্রদ্ধার পাত্র। সুতরাং তিনি যখন ধনুহস্তে লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন তখন সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ হইল এবং অনেকের মনে দৃঢ় ধারণা হইল, যে ইনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। বিষ্ণুমিত্র তাঁহাকে বলিলেন "বৎস, প্রথমে লক্ষ্যে চিত্ত নিবিষ্ট কর, তৎপূর্ব্বে শরত্যাগ করিও না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গুরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি দেখিতে পাইতেছ, আমাকে বল।" ব্রহ্মগুপ্ত উত্তর করিলেন, "পাখীটী মাত্র দেখিতেছি, আর কিছুই দেখিতেছি না।" বিষ্ণুমিত্র বলিলেন, "বেশ, আরো কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, এখনও শরত্যাগ করিও না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন করিলে ব্রহ্মগুপ্ত উত্তর করিলেন, "পক্ষীর চক্ষুটী মাত্র দেখিতেছি, তাহা কখনো আমার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতেছে, মুহূর্ত্তমধ্যে আবার ঘুরিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে।"

বিষ্ণুমিত্র বলিলেন, "ঠিক হয়েছে, এখন দূরত্ব ও সময়ের পরিমাণ ঠিক করিয়া যথামুহূর্ত্তে তীর নিক্ষেপ কর।" দুই এক মুহূর্ত্ত পরেই ব্রহ্মগুপ্ত তীর নিক্ষেপ করিলেন; ইহা ময়ূরের বামচক্ষুতে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ চক্ষু ভেদ করিয়া বহির্গত হইল; সকলেই দেখিতে পাইল ময়ূর পূর্ব্ববৎ ঘুরিতেছে, কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের শর উহার চক্ষুতে সংলগ্ন রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে তুমুল আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল, ঘোর রবে তূরীভেরী শঙ্খ প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্য বাজিতে লাগিল। এই কোলাহল শেষ না হইতেই অলোকসামান্য রূপবতী গঙ্গাদেবী সখীগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া মঞ্চ হইতে অবতরণ করতঃ বিজয়ী বীরের কণ্ঠে রত্নমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে মনোনীত পতিরূপে অভিবাদন করিলেন। চারিদিকে আনন্দ ও উৎসাহের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এই আনন্দ ও অভিনন্দনের রোল চলিল, তৎপরে ক্রমশঃ ইহা নিবৃত্ত হইল ও সভাস্থল নীরব হইল।

অনতিবিলম্বেই গঙ্গার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। তৎপরে যজ্ঞদত্তের অনুরোধে এইস্থলেই বিষ্ণুমিত্রও তদীয় কন্যা সরস্বতীর বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এই অনুষ্ঠান দ্বয়ে যে আনন্দোৎসব হইল তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। বিবাহিত যুবক যুবতীগণ কি ভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন তাহারও বিশেষ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা অনভিজ্ঞ তাঁহাদিগকে কেবল এইটুকু বলা আবশ্যক যে মৈত্রেয় ক্ষত্রিয়-কন্যা বিবাহ করিয়াও ব্রাহ্মণই রহিলেন, ইহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব কিছুই কমিল না; আর ব্রহ্মগুপ্ত যজ্ঞদত্তের কন্যা বিবাহ করিয়া উন্নীত বা অবনত কিছুই হইলেন না, পূর্ব্বে যেমন সম্মানিত বৈশ্য বা বণিক ছিলেন তাহাই রহিলেন। জাতিভেদে এখন যাহা বুঝায়, তখন তাহা বুঝাইত না।

যাঁহার নামে এই 'সমাজ-চিত্রের' নামকরণ করিয়াছি, এখন তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া 'চিত্র' শেষ করিব। বলা বাহুল্য যে তিনি বর্ণিত অনুষ্ঠানদ্বয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নী সহ উপস্থিত ছিলেন এবং অতি আগ্রহের সহিত সমুদয় আয়োজনে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন যেরূপ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, স্বামীর বনগমন পর্য্যন্ত সেরূপই চলিতে লাগিল। বনগমন সময়ে স্বামী তাঁহার ও কাত্যায়নীর মধ্যে ধনবিভাগ করিতে চাহিলে মৈত্রেয়ী বলিলেন, "আমি যাহা লইয়া অমর হইতে পারিব না তাহা লইয়া কি করিব?" (বৃহদারণ্যক, ২।৪।৩ ও ৪।৫।৩) কাত্যায়নী ও তদীয় সন্তানগণ ধনের অধিকারী হইলেন। মৈত্রেয়ীর গর্ভে সন্তান জন্মে নাই। তিনি অকাতর চিত্তে সপত্নী ও সপত্নীপুত্রদিগের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। মুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সংসার-নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিল। মৈত্রেয়ী সাংসারিক কার্য্যভার হইতে সম্পূর্ণ উন্মুক্তা হইয়া স্বামী হইতে লব্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সাধনে মগ্ন হইলেন। তাঁহার সপত্নী ও চিরসখী কাত্যায়নী প্রধানতঃ "স্ত্রীপ্রজ্ঞা" হইয়াও "ব্রহ্ম-

বাদিনী"* স্বকীয় সাধন-ফলে অধ্যাত্মজীবনে পরিপুষ্টা হইতে লাগিলেন। তদীয়া সন্তানগণও বিমাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি বশতঃ সুশিক্ষায় প্রতিপালিত হইতে লাগিল। আমরাও পাঠকপাঠিকাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এখানেই গল্প শেষ করিলাম। যদি কখনও অবকাশ হয়, গার্গীর আখ্যায়িকা বলিতে গিয়া "বৈদিক সমাজ-চিত্রের" অন্যান্য দিক্ দেখাইব।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

সৌজন্য, সামাজিকতা ও শিষ্টাচার।

প্রথম অভ্যুদয় সময়ে মানবজাতি যেমন ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি কেমন তাহা জানিত না, তেমনি সৌজন্য, সামাজিকতা ও শিষ্টাচার কাহাকে বলে, তাহাও জানিত না। প্রত্যেকে আহার নিদ্রা ও আত্মরক্ষার জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত, ক্রমে যখন মানবগণের বুদ্ধি ও জ্ঞানোন্মেষ হইতে লাগিল, সমাজবদ্ধ হইবার অভিলাষও তাহাদের মনে জাগ্রত হইল, তখন হইতে মানবগণের হৃদয়ে ক্রমে ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতির সঞ্চার হইল, এবং সৌজন্য, সামাজিকতা ও শিষ্টাচারের উৎপত্তিও আবশ্যক হইতে লাগিল। এক্ষণে ইহা উন্নততর আকারে প্রত্যেক পরিবার ও সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, দয়া প্রভৃতির মূলে যেমন এক প্রেম, কেবল স্থল ও পাত্রবিশেষে নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি সৌজন্য, সামাজিকতা ও শিষ্টাচারের নাম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এক মানব-প্রেমই ইহার মূল। কপটাচারী নরনারীগণের কথা স্বতন্ত্র হইলেও প্রকৃত ও বিশুদ্ধ সামাজিকতা এবং শিষ্টাচার মানবের প্রতি প্রেম ভিন্ন হইতেই পারে না। যেখানে হৃদয়ের সম্পর্ক নাই, সেখানে বরং সর্ব্বপ্রকারে নীরব থাকাই শ্রেয়, তথাচ কৃত্রিম সৌজন্য, সামাজিকতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন, স্বীয় জীবন ও সমাজের অমঙ্গলজনক এবং সন্তানগণের কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শক, সুতরাং অত্যন্ত দোষাবহ।

বিনয়, নম্রতা ও ধীরতা বিশিষ্ট সরল ব্যবহারের নামই সৌজন্য ও শিষ্টাচার। সামাজিকতা অর্থে সমাজ সম্বন্ধীয় ব্যবহার। এই সমস্ত ব্যবহার সুসংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত অবস্থায় লোকসমাজে প্রচলিত করিতে হইলে উন্নত শ্রেণীর মানবগণের মনোযোগ ও দৃষ্টান্তের আবশ্যক করে। পূর্ব্বকালে লোকশিক্ষার জন্য উন্নত শ্রেণীর মানবগণই সদুপদেশ প্রদান, সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন এবং সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়ন করিতেন। মানব জাতির মধ্যে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মানব দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে কৃতবিদ্য ও তদনুসন্ধানে সতত অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অসাধারণ মানব। যাঁহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, বা করিয়া থাকেন, ও সংসার-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ মানব। আর যাহারা মূর্খ, অসভ্য ও বর্ব্বর তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর মানব। সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, পরিবারে ভাই ভগিনী গুলির মধ্যে যেগুলি বয়োজ্যেষ্ঠ তাহাদের অনুকরণ মধ্যমগুলি, ও মধ্যমগুলির অনুকরণ কনিষ্ঠ গুলি করিয়া থাকে। সমাজের ও পৃথিবীর ভাই ভগিনীদের মধ্যেও এই নিয়ম। অনেকে বলিতে পারেন, তবে কেন সমস্ত সাধারণ মানব অসাধারণদের ন্যায় ও সমস্ত মূর্খ, অসভ্য, বর্ব্বর মানবেরা সাধারণের ন্যায় হয় না? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায়, যে উক্ত অনুকৃতি এতই ধীরে ধীরে মানব-চক্ষুর অগোচরে সাধিত হয়, যে মানুষ তাহা শীঘ্র প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হয়, যে যেমন জগতের সকল বিষয়েরই ক্রমাভিব্যক্তি অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়, তেমনি মানবজাতির সর্ব্বপ্রকার সুসংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত উন্নতি ও শিক্ষা অনুকরণ দ্বারা শ্রেণী পরম্পরায় অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহা হউক, লোকশিক্ষার জন্য প্রথম

* বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির স্ত্রীদ্বয়ের প্রতি উক্ত বিশেষণদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রেণীর মানবগণেরই অধিকতর দায়িত্ব, মনোযোগ, দৃষ্টান্ত ও চিন্তার আবশ্যক করে। বর্ত্তমান কালে সভ্য সমাজে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের মধ্যে নানা প্রকার কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। সরল ও অমায়িক শিষ্টাচার এখন নিতান্ত সুলভ নহে। উচ্চ শ্রেণীর ধনীগণের সৌজন্য শিষ্টাচার বা সামাজিকতা সাধারণতঃ অত্যন্ত অনুদার ও সঙ্কীর্ণ ভাবাপন্ন। তাঁহারা স্বীয় ধন মান বিদ্যা ও পদমর্য্যাদানুযায়ী অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের প্রতিই সৌজন্য ও সামাজিকতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত অন্য অপর সকলের প্রতি তাহা প্রদর্শনে সাধারণতঃ বিমুখ হইয়া থাকেন। যাহারা অসভ্য, কুসংস্কারাপন্ন, মূর্খ বলিয়া পরিগণিত তাহাদের প্রতি সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রদর্শন তাঁহারা ভয়ানক নীচতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবহার যে কেবল মূর্খ ও ধনজনহীন লোকদের মনোকষ্টের কারণ, তাহা নহে, স্বীয় স্বীয় হৃদয় মনেরও অবনতির পরিচায়ক। এরূপ ব্যবহারে আপনার হৃদয়কে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। কেন যে পূর্ব্বোক্ত লোকেরা ওরূপ অসভ্য কুসংস্কারাপন্ন ও মূর্খ হইয়াছে এবং তাহাদের জীবন যে কত কষ্টকর, তাহা তাঁহাদের ভাবিবার অবসর বা ক্ষমতা থাকে না। এরূপ ব্যবহার পুরুষ বা স্ত্রী, বিশেষতঃ স্ত্রী জাতিতে নিতান্তই অশোভন, কারণ মহারাজাধিরাজ হইতে পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সৌজন্য ও শিষ্টাচারের আশা করিয়া থাকেন। পাপী ও অন্যায়াচারীকে প্রশ্রয় দান ব্যতীত স্ত্রীজাতির সৌজন্য শিষ্টাচার পরিবারে, প্রতিবাসীতে, সমাজে, স্বদেশ ও বিদেশে সর্ব্বত্র উদার অকপট ও অক্ষুণ্ণ ভাবে বিস্তারিত থাকিবে, ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমান কালে উচ্চ শ্রেণীর ধনী মানবগণের উপরোক্ত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার সৌজন্য শিষ্টাচারের কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয়, যে আত্মমর্য্যাদার ভয়াবহ প্রাখর্য্য, এবং আত্মমর্য্যাদার বিকৃতার্থ গ্রহণই ইহার কারণ। অবশ্য আত্মমর্য্যাদা ও আত্মসম্মান মানব মাত্রেরই আবশ্যক, কিন্তু যাহার নিকট ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশবাসী, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন অবস্থাপন্ন ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ভয়ত্রস্ত হইয়া দূরে পলায়ন করে, সেরূপ আত্মমর্য্যাদা কখনই মনুষ্যত্ববিধায়ক, পৃথিবীর সুখ শান্তিপ্রদ ও সমুন্নত মনের পরিচায়ক নহে। যে আত্মমর্য্যাদা নিদাঘকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড কিরণ বিস্তার করিয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করে, সে আত্মমর্য্যাদা কখনই মনুষ্য সমাজে মিত্রতা উৎপাদন, ও চরিত্রে গৌরব আনয়ন করিতে সমর্থ নহে।

যে আত্মমর্য্যাদা প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল ও সরল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়ের সদ্ভাব প্রস্ফুটিত করে, সর্ব্বজনীন প্রেম, হিতৈষণাবৃত্তি, স্বদেশের অভাব চিন্তাকে বর্দ্ধিত করে, সেই আত্মমর্য্যাদা চিরদিন হৃদয়ে পোষণ করিবার যোগ্য, নতুবা আত্মমর্য্যাদা যদি নিদাঘ-কালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ হয়, তাহা হইলে হৃদয় হইতে সৌজন্য শিষ্টাচার দূরে পলায়ন করিবে ও সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া ব্যথিত অন্তরে চলিয়া যাইবে। যে আত্মমর্য্যাদা ন্যায় ও সত্যকে সর্ব্বোপরি সম্মান প্রদর্শন করে, যে আত্মমর্য্যাদা প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় সকলের সুখ, কর্ম্মোৎসাহ ও আনন্দজনক, সেই আত্মমর্য্যাদায় সৌজন্য ও শিষ্টাচারের কোন ক্ষতি হয় না, বরং তাহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করে।

আত্মমর্য্যাদার বিকৃতার্থ গ্রহণ করিয়া যখন নরনারী উন্মত্ত হয়, তখন কেবল দুইটি চিন্তা বিশেষরূপে হৃদয়ে জাগরূক রাখিলে তাহার মঙ্গল হইতে পারে। প্রথম চিন্তা এই, যে আমি যাহাদিগকে পর বলি, ছোট বলি, বা ঘৃণা করি, তাহারা কেহই আমার পর, ছোট, বা ঘৃণার্হ নহে। গ্রহ নক্ষত্র অবধি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত, সকলেই আমার জীবন ধারণ ও উন্নতির সহায়, ইহারা না থাকিলে আমার নিমেষের জীবন ও নিমিষের উন্নতি অসম্ভব, আমার মানুষ নামই অসম্ভব। আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, আর না পাই, ছোট বড় সকলেই আমার সহায়। এইরূপ চিন্তায় ছোট বড় সকলের প্রতি শিষ্টাচার উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্বিতীয় চিন্তা এই, যে আমি যে বিষয়ে পরিবৃত হইয়া আত্মমর্য্যাদার সীমা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি, এ ক্ষণভঙ্গুর সংসারে সেই সকল বিষয় কালগর্ভে বিলীন

হইতেই কতক্ষণ! আমি এই নশ্বর সংসারে কয়টা দিনই বা বাস করিতে আসিয়াছি, সর্ব্বজনীন প্রেম ও বৈরাগ্যোদ্দীপক উপরোক্ত চিন্তা দুইটি সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিলে নরনারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অকপট শিষ্টাচারী ও বিনম্র-প্রকৃতি হয়।

বর্ত্তমান কালে কেহ যে সৌজন্য শিষ্টাচার জানেন না, বা কাহারও প্রতি শিষ্টব্যবহার করেন না, আমরা তাহা বলিতেছি না, কিন্তু পূর্ব্বে যাঁহাদের কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রায়ই সঙ্কীর্ণ ও অনুদার। যাঁহাদের ধন, মান বিদ্যা বা পদমর্য্যাদা তাঁহাদের অবস্থানুযায়ী নয়, তাঁহাদের প্রতি তাঁহারা অনেকেই প্রায় সৌজন্য ও শিষ্টাচার-বিমুখ। ইহা প্রত্যক্ষ কথা। চিন্তা করিয়া দেখিলে ছোটই বা কি? তুমি যত বড়ই হও না কেন, ছোট বড় সকলে মিলিয়া তোমাকে বড় করিয়াছে, তাই আজ তুমি বড়! সামান্য ধূলিকণাও সূর্য্যালোকের সহায়তা করে, বর্ণমালাও জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনের সহায়তা করে, সামান্য পুষ্পরেণু দ্বারা সমস্ত উদ্ভিদ-জগৎ জীবিত রহিয়াছে, সামান্য শ্রমজীবী নারীগণের শ্রম দ্বারা মহা জ্ঞানীগণের মস্তিষ্ক সবল হইতেছে। বস্তুতঃ ছোটও কিছু নয়, বড়ও কিছু নয়, সংসার অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, এবম্বিধ চিন্তাসমূহ দ্বারা নতমস্তক এবং অকপট ভাবে ছোট বড় সকলের প্রতি সৌজন্য ও শিষ্ট ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পরস্পরের প্রতি শিষ্ট ব্যবহার সকলেই করিতে পারেন, কিন্তু আমি যাহার প্রতি শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছি বা করিতেছি, সে আমার প্রতি ভয়ানক অশিষ্টাচার করিতেছে, এরূপ স্থলে সৌজন্য শিষ্টাচার রক্ষা করা কঠিন। কথিত আছে, যে সময় দেব-দানবে যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময় দানবেশ্বর ও তাঁহার পরিবারের সকলে শচীদেবীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কেবল বৃত্রাসুরের পুত্রবধূ স্বাধীন-চিন্তা ইন্দুবালা তাঁহার প্রতি সুমিষ্ট শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইতিহাসে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন রাজ্যের নারীগণ এরূপ অসাধারণ উন্নতমনা, যে যুদ্ধের সময় আহত ও কাতর বিপক্ষ সৈন্যগণেরও সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডার অশিষ্টাচারিণী মাতার প্রতি, মহাত্মা সক্রেটিস্ অশিষ্টাচারিণী স্ত্রীর প্রতি, অসাধারণ মহাপ্রাণ যীশু অশিষ্টাচারী প্রাণহন্তাদের প্রতি, ভক্ত চূড়ামণি ধ্রুব বিমাতার প্রতি, এবং মহাপ্রেমিক চৈতন্য জগাই মাধাইয়ের প্রতি কিরূপ সুমধুর ও শিক্ষাপ্রদ শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এবম্বিধ অসাধারণ শিষ্টাচার বিরল হইলেও একবারে অসম্ভব নহে।

আমাদের এদেশে নানা প্রকার সমাজ আছে, হিন্দু-সমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজ, খৃষ্ট-সমাজ, ইংলণ্ড-প্রত্যাগতগণের সমাজ, মুসলমান সমাজ প্রভৃতি। যত দিন এ জগতে মানবজাতি বিচরণ করিবে, ততদিনই মানবের ও প্রত্যেক সমাজের রুচি, প্রকৃতি আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে পার্থক্য থাকিবে, এই সকল পার্থক্যের জন্য সমাজ বিশেষের প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা প্রদর্শন কখনই কর্ত্তব্য নহে। কোন সমাজের মধ্যে যদি দুই চারিজন ব্যক্তি অন্যায়াচারী বা কোন প্রকার দোষে দোষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ দূষণীয় মনে করিয়া ঘৃণা বা উপেক্ষা করা সদাশয় ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক সমাজকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, প্রত্যেক সমাজের নরনারীকে নিজ ভাই ভগিনীর ন্যায় মনে করিয়া সৌজন্য, শিষ্টাচারপ্রদর্শন, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি এবং সাদর-সম্ভাষণ করিতে হইবে, অবস্থা সচ্ছল হইলে মধ্যে মধ্যে কিম্বা বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ডে প্রত্যেক সমাজের ভাই ভগিনীগণকে আদর অভ্যর্থনা ও বিশেষ শ্রদ্ধা যত্ন সহকারে বাটীতে আনিয়া, আলাপ পরিচয় আহারাদি করাইতে হইবে। কোন সমাজের কোন দোষের কথা মনে করিয়া সেই সমাজের সকল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে, বরং যাহাতে সেই সমাজের সকলে তাঁহাদের দোষ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে ও পরিহার করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা অপরাপর সমাজের কর্ত্তব্য। প্রত্যেক সমাজেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ গুণ উদার ও সরল দৃষ্টিতে

দেখিতে হইবে। যেমন আমরা প্রত্যেক পরিবারেই ভাই ভগিনীদের মধ্যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ও অপরাধ করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাগ করিয়া থাকি না, তেমনি প্রত্যেক সমাজেরই ভাই ভগিনীগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ অপরাধ সমূহ গ্রাহ্য না করিয়া সকলকেই বিশেষ ভালবাসিতে ও আদর যত্ন করিতে হইবে। যে কোন সমাজেরই হউক না কেন, দরিদ্র বিদ্যার্থীগণকে বিদ্যা ও আহার্য্য দান করিতে হইবে। যে কোন সমাজেরই ব্যক্তি হউন না কেন, তাঁহাদের আপদ, বিপদ, রোগ শোক অশান্তিতে আত্মীয়-স্বজনের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। আমাদের নিজ নিজ সমাজের শ্রেষ্ঠতা স্মরণ করিয়া আমরা যেন অপরাপর সমাজের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ না করি। যে কোন সমাজেরই ভাই ভগিনী হউন না কেন, আমরা যখনই তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিব, তখনই সেই দৃষ্টি যেন সরল, উদার ও গভীর প্রীতিব্যঞ্জক হয়।*

শ্রীবসন্তকুমারী বসু।

জীবন-সংগ্রামে নারী।

বর্ত্তমান যুগে জীবন-সংগ্রাম অতি কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। জীবন ধারণ করিবার জন্য—এই সংসারে কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য লোকের প্রায় পোনের আনা শক্তি ব্যয়িত হইতেছে। নারীজাতি মানব-সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ, কিন্তু সভ্যসমাজ চিরদিনই জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হইতে নারীকে বহুল পরিমাণে মুক্তি দিয়া আসিতেছে। পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য পুরুষ যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইলে নারীকে অবশ্য তাহার ফল সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়, তাহাকে পরিবারের ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়, পতি-পুত্রকে যথাসম্ভব সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়া কষ্টের অপেক্ষাকৃত গুরুতর অংশ তিনি স্বেচ্ছাক্রমেই আপন স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন। সুতরাং সাক্ষাৎ ভাবে অংশভাগিনী না হইলেও পরোক্ষভাবে জীবন-সংগ্রামে তাহার দায়িত্ব নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নারীগণ সাক্ষাৎভাবেও জীবন সংগ্রামে অবতরণ করিতে বাধ্য হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য নারীগণ প্রধানতঃ তিন প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে। প্রথমতঃ তাহারা স্বাধীন ভাবে কতকগুলি ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে, যথা, ডাক্তারী, ধাত্রীর কার্য্য, শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ তাহারা পুরুষদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাদের সমকক্ষরূপে কতকগুলি কায করিতেছে, যথা, কাপড়ের কল ইত্যাদিতে শ্রম-জীবীর কার্য্য। তৃতীয়তঃ পুরুষদিগের সহকারীরূপে তাহারা সহজসাধ্য কতকগুলি কায করিতেছে, যথা, ক্ষেত্রে মজুরের কার্য্য। এই তিন বিভাগেই নারীগণ দিন দিন অধিকতর পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে।

এই বিষয়ে যে সকল প্রামাণ্য পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়, ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে—১৮৪১ হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৫০ বৎসরে—কলকারখানায় পুরুষদিগের সংখ্যা শত করা ৫৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু নারীর সংখ্যা শতকরা ২২১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।* ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এই সকল কার্য্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যার অনুপাত ছিল ১৪ : ৫; কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই অনুপাত দাঁড়াইয়াছে ১৯ : ১৪;† সুতরাং ষোল বৎসর পূর্ব্বে পুরুষ ও নারীর সংখ্যার মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান ছিল। এখন সম্ভবতঃ নারীর সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি অনেক দেশেই নারীর সংখ্যা এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষে সঠিক সংখ্যা সংগ্রহ করা কঠিন, কিন্তু উপর্যুক্ত দেশসমূহের ন্যায় এদেশেও শ্রমশিল্পে নারীর সংখ্যা যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গত সেন্সসের বিবরণীতে দেখা যাইতেছে যে কাপড়ের কলের সূতা কাটা কার্য্যে যে স্থলে এক হাজার পুরুষ নিযুক্ত আছে সে স্থলে ৫৬৩৯ জন নারী নিযুক্ত আছে।

* এই প্রবন্ধটী মহিলা-সমিতিতে পঠিত হইয়াছিল।

* Charles Booth's "*Occupations of the People.*"

† Mulhall's "*Dictionary of Statistics.*"

সুতাকাটা এদেশে চিরদিনই নারীদিগের কায, সুতরাং কাপড়ের কল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীগণই যে বেশী দক্ষতার পরিচয় দিতেছে ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কিন্তু শ্রম-সাপেক্ষ কার্য্যগুলিতে নারীকে পুরুষের বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইতেছে। এই সকল কার্য্যে শারীরিক শক্তির অল্পতাই তাহাদের প্রধান বাধা। এই বাধাও ক্রমশঃ দূর হইতেছে, কারণ উন্নততর কলের আবিষ্কারে পূর্ব্বের ন্যায় তত বেশী শারীরিক শক্তি ব্যবহারের আবশ্যক হইতেছে না। এখন নারীগণ শারীরিক শক্তির উন্নতি সাধনেও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে; সুতরাং এই ক্ষেত্রেও তাহারা অন্ততঃ পুরুষের সমকক্ষ হইবে না, এমন কথা এখনও বলা যায় না।

শ্রম-সাপেক্ষ কার্য্যে নারীগণের প্রবেশ পক্ষে আর এক বাধা প্রচলিত রীতি পদ্ধতি। পুরুষদিগের ন্যায় দিবসের সকল সময় তাহারা কায করিতে পারে না। রাত্রে তাহাদিগকে কোন কাজ করিতে দেওয়া হয় না। স্ত্রীজনোচিত কোমলতাও এই বিষয়ে এক বাধা স্বরূপ। ঘরে বসিয়া যে কাজ করিতে পারা যায়, তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট, বাহিরে অধিক উপার্জ্জনের সম্ভাবনা থাকিলেও সহজে তাহা করিতে চাহে না। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অন্তরায়ও লোপ পাইতেছে।

শ্রমশিল্পে উন্নতি লাভ বিষয়ে স্ত্রীজাতির আর এক বাধা, অজ্ঞানতা। শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে হইলে ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কোন্ প্রকার পণ্য বাজারে বেশ বিক্রয় হইবে, কোন্ দ্রব্যে বিশেষ লাভ পাওয়া যাইবে নারীগণ এ সকল তত্ত্ব রাখিতে পটু নহেন। চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া অল্প লাভকর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অধিক লাভজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে তাহারা অভ্যস্ত নহে। কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের এই ত্রুটীও দূর হইতেছে।

লাভজনক কর্ম্মের উদ্দেশ্যে স্ত্রীজাতি স্থানান্তর গমনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহা যতই বর্দ্ধিত হইতেছে তাহারা কর্ম্মের উদ্দেশ্যে ততই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এ মাসের চিত্র।

মেরী ম্যাগডালিন—ইনি প্রথম-জীবনে পতিতা নারী ছিলেন। মহাত্মা যীশুর সংস্পর্শে আসিয়া, অতি পবিত্র ধর্ম্মজীবন লাভ করেন। খৃষ্টীয় সমাজে ইনি উত্তর কালে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন।

মালতী—মহাকবি ভবভূতির "মালতী মাধব" সংস্কৃত ভাষায় এক খানি বিখ্যাত নাটক। অনেক চেষ্টার পর মালতী তাঁহার প্রেমাস্পদ মাধবকে লাভ করেন। বর্ত্তমান চিত্র খানি রাজা রবিবর্ম্মাকর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। মাধবকে লাভ করিবার আশায় পূজা দিবার জন্য মালতী মন্দিরে যাইতেছেন।

পাঠিকাগণের প্রতি নিবেদন।

ভারত-মহিলার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমাবধি প্রচারিত বিজ্ঞাপন অনুসারে এই অষ্টম সংখ্যার সহিত আমরা দ্বিতীয় বর্ষ শেষ করিলাম। বৈশাখে তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে। অল্প সময়ের মধ্যেই ভারত-মহিলা বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

আমরা সাধ্যানুসারে আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছি, সহৃদয় লেখকলেখিকাগণও আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। মাননীয়া পাঠিকা ভগিনীগণের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। ভারত-মহিলা প্রধানতঃ মহিলাগণেরই পত্রিকা। তাঁহারা ইহার উন্নতি-সাধনে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইবেন, আমরা এ আশা অবশ্যই করিতে পারি। আমাদের প্রত্যেক পাঠিকা যদি ২।১ জন করিয়া ভারত-মহিলার নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন তবে আমাদের প্রচুর উপকার হয়। আয় বৃদ্ধি হইলে আমরা পত্রিকাখানির আরো উন্নতি সাধন করিতে পারি। আশা করি নূতন বৎসরে আমাদের পাঠিকাগণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন, এবং তাঁহাদের সাহায্যে আমরা অনেক নূতন গ্রাহক লাভ করিব। যাঁহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবেন আমরা ভারত-মহিলায় তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিব। কোন কোন পাঠিকা ইতিপূর্ব্বেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

১১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী-কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাব-সুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরী শক্তি অপরিসীম। অনেক সংকটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক-পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তিসুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়, আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যত্বের



দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী-সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মী-রূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটি পবিত্রব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ টাকা, প্যাকি ও ডাঃ মাঃ।৶০ আনা

কেশরঞ্জন তৈল।

(শিরোরোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

কেশরঞ্জন—মস্তিষ্ক শীতল করে, মাথাঘোরা, মাথাধরা ও মাথার জ্বালা নিবারণ করে, মনের প্রফুল্লতা ও চিত্তের সুস্থিরতা সম্পাদন করে, দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি করে এবং হস্ত-পদতলের জ্বালার শান্তি করে। বায়ুরোগে, উন্মাদরোগে, মূর্চ্ছারোগে এবং অন্যান্য বাতপিত্তজনিত যাবতীয় রোগেই ইহা অমৃতের অধিক উপকারী।

কেশরঞ্জন—কেশের অত্যন্ত উপকারী। কেশ দৃঢ় করিতে, কেশ ঘন কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত করিতে, ক্ষুদ্র কেশ দীর্ঘ করিতে, কর্কশ কেশ কোমল করিতে ও রুক্ষ কেশের চাকচিক্য বাড়াইতে ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট তৈল আর নাই। এত গুণের আধার বলিয়াই কেশরঞ্জন রমণীগণের আদরের সামগ্রী।

কেশরঞ্জন—টাক নিবারণ করিয়া টাকের স্থানে সুন্দর কেশ উৎপাদন করে, মরামাস (খুসকি) নষ্ট করে, মাথার ও গায়ের দুর্গন্ধ দূর করে, এবং মস্তক হইতে নিত্য নানাজাতীয় ফুলের সৌরভ বিকীরণ করে। ইহা অত্যন্ত পাতলা বলিয়া, এই তৈল ব্যবহারে কখনও চুল চট্‌চটে হয় না।

কেশরঞ্জন—বিলাসের অপূর্ব্ব সামগ্রী; প্রিয়জনকে দিবার উপযুক্ত উপহার। বিলাসীর ব্যবহারের চরম উপাদান—বিলাসিনীরও বিশেষ প্রিয়। এক কথায় বলিতে হইলে, রাজা—প্রজা, ধনী—দরিদ্র, পণ্ডিত—মূর্খ, সংযমী—বিলাসী, রোগী—নিরোগ, সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা, মাশুলাদি।৶০ আনা, তিন শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, মাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এণ্ড্ সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।